কেন এই উপন্যাস

আজকের এই সমস্যাসঙ্কুল জটিল পৃথিবীতে আত্মসচেতনতাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকায় না, নিজেরটা নিয়েই সবাই ব্যস্ত থাকে। দাম্পত্য জীবনেও সেই লেনা দেনা এখন প্রকট। মেয়েরা যখন শিক্ষিত ছিল না, পুরুষের তখন সমস্যা ছিল না। পুরুষ যেমন তেমনভাবে মেয়েদের ব্যবহার করত। মেয়েরাও জানত এই আমার প্রাপ্য কিন্তু আজ—কাল হয়েছ মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে। বুদ্ধির মাপকাঠিতেও তারা বিচার করে দেখে আমরা পুরুষের চেয়ে কম কিসে? নারী পুরুষ উভয়েরই তো একই চাওয়া পাওয়া। বরং নারী পুরুষের চেয়ে অনেক অংশে প্রধান। তারা ঘর সামলায়। সন্তান ধারণ করে, পালন করে। সংসারের অনেক মঙ্গল তারাই ডেকে আনে। একটি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে পুরুষের লড়াই করা সহজ হয়। তাছাড়া শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যে সুখ দেয় তারও মূল্য অনস্বীকার্য।

কিন্তু পুরুষ আজও তা মানতে চায় না। সে বলে, আমিই প্রধান। পুরুষ সেই প্রাচীন যুগের মত নারীর ওপর অত্যাচারই করতে চায়। আজকের বধূহত্যার অনেক অংশ এই মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষিত মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না! সমাজ বলে, তাহলে তোমরা বেওয়ারিশ, যে যেভাবে পাবে লুটে পুটে খাবে। এই মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে এই আখ্যানভাগ। আপনারাও পড়ে লক্ষ্য করুন কী দারুন এই সমস্যা! বহু দাম্পত্য জীবন যে আজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে এই নিদারুণ সমস্যার জন্যে।

অমরেন্দ্র দাস

এই লেখকের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেগমরিজিয়া
জেবুন্নিসা
নজরানা
সরদানা
বাঈ বেগম বাঁদী
নর্তকী নিকী
সিরাজের ফৈজী
রমনাবাঈ
দিলবাহার
নেভে নাই দীপ
এই সেতু সেই সেতু
ইমনরাগের সানাই
বেকসুর খালাস
বিদ্রোহিনী
ক্রীতদাসী
পুতলীবাঈ
শনিবারের সম্রাট
কালিঘাটের ঘরসংসার
শ্রীমতী সংবাদ
ঐতিহাসিক রচনা সমগ্র ১—৭খণ্ড

প্রবন্ধ

রাজনারায়নেয় কলকাতা
শরৎচন্দ্রের নারী সমাজ ও
সেকালের একালের বারবনিতা
সংস্কারে আবদ্ধ নারী

পৌরানিক উপন্যাস

রূপে অরূপে মহামায়া
হিমালয়কন্যা পাবতী

সামাজিক উপন্যাস

নূপুরছন্দ
অন্যতরঙ্গ
সুলতার স্বর্গ
এ পৃথিবী স্বর্গ নয়
আকাশ কন্যা
পটে আঁকা ছবি
নীল পদ্মের আলপনা
আলেয়া মঞ্জিল
আলোর লগন
তিতিক্ষা
কয়েকঘন্টা বৃষ্টি
রঙ বদলায়
দিন বদলায়
তবু আকাশ রাঙা
কুহু কুহু
বিবর্ণপলাশ
দুজনের সঙ্গে দুজনে
দুই পতিতার গল্প
গল্প গ্রন্থ
মেমবো
লুডো
শ্রেষ্ঠ গল্প

কিশোর উপন্যাস

নাম নেই ছেলেটির
অদৃশ্য দেবতা
কিশোর ঐতিহাসিক সমগ্র১—৫খন্ড

নাটক

এর শেষ নেই
ক্রীতদাসী
অপ্সরা

তুই ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখ্!

ভেবেছি।

আরও একটু ভাব্। তুই মেয়ে ভুলে যাস্নি।

মেয়ে বলেই তো এইভাবে ভাবছি।

মেয়েদের অনেকরকম বিপদ আছে।

আছে বলেই তো আমার চ্যালেঞ্জ। মেয়ে কি মানুষ নয়? তাদের বিয়ে করতেই হবে।

তোকে পড়াশোনা শেখানোই দেখছি কাল হয়েছে।

পড়াশুনা শিখেছি বলেই তো এইভাবে ভাবতে শিখেছি। না'হলে সেই চিরাচরিত তোমাদের দেওয়া একটা লোকের গলায় মালা দিয়ে বছর বছর তার ছেলে পেটে নিয়ে হাঁড়ী ঠেলতে হত।

এতো সব মেয়েরাই করে। এ আর নতুন কি?

চকিতা রেগে গেল, না আমি অন্তত করব না।

করবি না তবে করবি কি?

তোমাকে না বহুবার বলেছি। আমি চাকরি করব। নিজেরটা নিজে চালাব। তোমরা যদি আমাকে থাকতে না দাও, অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করব।

মার মুখ শুকিয়ে গেল, চাকরী তোকে দিচ্ছে কে?

সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার উইলফোর্স আছে, চাকরী আমি যোগাড় করবই।

মানসী মুখ শুকনো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মা চলে গেলে চকিতা খাটে শুয়ে 'ফ্রি ওম্যানের' ওপর একখানি ইংরিজী ফিকসন নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। তার বেশ মজা লাগছে। বাপ-মা চিরকাল মেয়ে বড় হলে বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে।

আজ সে তার বিরুদ্ধাচরণ করছে। অর্চনা শুনে বলে, তুই পারবি বিয়ে না করে থাকতে? পুরুষগুলো যা হন্যে, ঠিক থাকতে দেবে?

দেখা যাক্ না। হন্যেদের ঠেকিয়ে যদি খাড়া থাকতে পারি, নারীসমাজে দৃষ্টান্ত থাকবে। তখন এই মেয়েরাই বলবে, চকিতা চ্যাটার্জী পারতে পারে আমরা পারব না!

কিন্তু ভাই আমার অতো সাহস হয় না।

তুই বিয়ে করবি। আর একটি লোকের সেবাদাসী হয়ে বছর বছর তার দেওয়া উপহার পেটে নিবি।

শুধু কি তুই এইজন্যে বিয়ে করতে চাস্ না?

কারণ অনেক। তবে এটা ভাইটাল। মেয়েরা পুরুষের অধীন এটা ভাবতেই আমার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে ওঠে।

কিন্তু এ তো ভাই ভগবানের মার।

সেইজন্যেই তো আমার জেহাদ।

হঠাৎ চকিতার মনে পড়ে গেল একটা কোম্পানীতে তার ইন্টারভিউ আছে। মিঃ নীলম বাজপেয়ী সম্ভবত তার প্রতি দুর্বল। চাকরীটা হলেও হতে পারে। সেই পুরুষের হাতছানি।

চকিতা মনে মনে হেসে উঠল। বাইরেটা দেখেছ নীলম। চকিতার ভেতরটা তো দেখনি।

বইটা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে চিরুনি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই বাপের গলা ভেসে এল। ওকে বলে দিও মানু, এসব বেলেল্লাপনা এ বাড়ীতে চলবে না। সে যদি নিজের ইচ্ছায় চলে, যেন এ বাড়ী ত্যাগ করে।

চকিতা আয়নার সামনে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে হাসল. অতো সগর্বে বলতে হবে না বাবা, চকিতা নিজের ব্যবস্থা করেই নেবে।

তাড়াতাড়ি পোষাক পালটালো। সাজগোজ ভালই করল। এখন তো তাকে পুরুষ বধ করতে হবে। তাই ঠোঁটে ডিপ্ পিঙ লিপষ্টিক. চোখে আই লাইনার, কপালে মানান সই সোয়েটের লাল বড় টিপ পরল। দেখতে তো তাকে খারাপ নয়। ডিমালো ফর্সা মুখের ওপর চোখ দুটি অসম্ভব টানা ও বড়।

তার এই একুশ বছর জীবনে ছেলে এসেছে এক ডজন। দাদার বন্ধু, বন্ধুর ভাই, আত্মীয়, অচেনা। সিদ্ধার্থ তো পথে দেখলেই পিছন ধরবে।·· চকিতা চললে কোথায়? কম্পানী দেব? বড়লোকের ছেলে। একবার বললেই গাড়ী নিয়ে ঘুরবে। চকিতার বেশ মজা লাগে এই সব দেখে। একটা যুবতীর পিছনে কতকগুলি যুবক। একটু প্রশ্রয় দিলেই ··। অনেক মেয়ে বলে এই তো ধর্ম। এর মধ্য থেকেই একটাকে বেছে নিতে হবে।

চকিতার ঘেন্না লাগে। যেগুলো রাস্তার কুকুর! তাদের একটাকে নির্যাতন করব? বিষ কি দোকানে পাওয়া যায় না?

বেরবার মুখে মায়ের দরজার সামনে দাঁড়াল। দেখল বাবা ঘরে। মুখ ঘুরিয়ে মাকে বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি মা।

খেয়ে গেলি না!

এসে খাব। ও আর দাঁড়াল না। অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌ এগারটায়। দশটা বেজে গেছে। বাস ট্রাম ঠেঙিয়ে পৌঁছতে এগারটা হয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। উঠে আসছিল দাদা ও দাদার বন্ধু কাজল। শ্যামল বোনকে দেখেই দাঁড়াল, কি রে মুখপুড়ী চল্‌লি কোথায়? কাজলের দিকে না তাকিয়ে চকিতা উত্তর দিল, ইন্টারভিউ দিতে।

তুই কি তাহলে ঠিকই করেছিস্‌ বিয়ে করবি না?

একজন অনার্স গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে এ প্রশ্ন করাটা কি বাহুল্য নয়? শ্যামল অপ্রতিভ হল, গ্র্যাজুয়েট তো অনেক মেয়েই হচ্ছে, কিন্তু তোর মত ডিসিশন নিতে কাউকে দেখি না।

চকিতা চোখ নাচিয়ে বলল, দেখনি দেখো।

যাক্‌ তুই না বিয়ে করলে আমারই লাভ। বাপের চল্লিশ হাজার থেকে গেল। সেটা পরে আমার কাজে লাগবে।

তুমি তো ঐ তালেই নাচ্ছ।

না না সত্যি বিশ্বাস কর। অতটা সেলফিস আমি নয়। এমনি কথার পিঠে কথা এল বলে বললাম।

চকিতা সত্যিই কি তুমি বিয়ে করবে না! এই সময়ে কাজল

প্রশ্ন করল।

চকিতাও চটপট উত্তর দিল, করলে তো আপনারও চান্স ছিল কাজলদা। কাজল একটু মিইয়ে গেল। চকিতা আর না দাঁড়িয়ে নিতম্ব দুলিয়ে পথে এসে নামল। চকিতার দেহটিও সেক্সি। ভারীনিতম্ব, চলার ছন্দে ওঠানামা করে। সরু কোমর। বুকও বেশ নিটোল। কাপড়ের আড়ালে সহজে চোখে পড়ে। এই শ্রীছন্দ নারী শরীর নিয়ে চকিতা এপৃথিবীতে যে বিদ্রোহ আ'নতে চাইছে পারবে কি? চকিতাও সেটা জানে। জানে তার রূপের ঐশ্বর্য এতো চমকপ্রদ, যে কোন পুরুষ পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। তাতেই তো মজা লাগে চকিতার। চকিতা তাই মনে মনে বলে, আমি এই জন্যে কুকুরগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব কিন্তু কখনও ধরা দেব না।

কয়েকবার আসার জন্যে রিসেপ্‌সনিষ্ট মালবিকা চিনত, তাই চকিতাকে দেখে ইংরিজীতে বলল, মিঃ বাজপেয়ী আপনার জন্যে ওয়েট্‌ করছেন। কয়েকবার খোঁজও করেছিলেন।

চকিতা হেসে চলে যেতে গেলে মালবিকা বলল, এডভান্স কন্‌-গ্রাচুলেশন্‌ জানালাম মিস চ্যাটার্জী।

থমকে দাঁড়াতে হল চকিতাকে। —অর্থাৎ?

গেলেই জানতে পারবেন। বলে মালবিকা এমন মনোহারিণী হাসি হাসল, চকিতার আর দাঁড়ান হল না। বুঝল খবর খুবই শুভ। অর্থাৎ চাকরী তার হয়ে গেছে।

যেতে যেতেও সে আর একবার হাসল। সে তো জানতই। নীলম বাজপেয়ীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝেছিল, এ লোকটি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে। মেয়েদের কোয়ালিফিকেশন যাই থাক্‌, আসল কোয়ালি-ফিকেশন্‌ আট্রাকশন। চকিতা জানে সেটা তার আছে।

নীলম বাজপেয়ীর ঘরে ঢুকতেই তিনি সহর্ষে আহ্বান জানালেন, আরে, আসুন আসুন মিস চ্যাটার্জী। আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে ওয়েট্‌ করছি।

চকিতা সামনের ফোমের চেয়ারে বসতে বসতে ভ্রূ কুচকাল, কিন্তু এখনও তো এগারটা বাজেনি!

নীলম বাজপেয়ী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিলেন, আমারই গ্রেট মিষ্টেক, ওটা এগারটা না দিয়ে সাড়ে দশটা দেওয়া উচিত ছিল।

চকিতার ভেতরের হাসিটা আবার গুলিয়ে উঠল। শো এণ্ড শো কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটার, হুটেডবুটেড একজন বিশিষ্ট ধনী লোক নারীদের কাছে কি দুর্বল। চাকরীটা নিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

২

কি খাওয়াবি বল্‌তো অর্চনা?

এই দুপুরবেলা কি খেতে চাস্ বল্।

এখন আমি ভাত খাব। খাওয়াতে পারবি?

অর্চনার মুখ শুকিয়ে গেল। কেন বাড়ী থেকে খেয়ে বেরোস্ নি?

অতো জবাব দিতে পারব না। ভাত খেতে চেয়েছি, ভাত থাকলে খেতে দিবি, না থাকলে দিবি না ব্যস্!

এই বন্ধুকেই ভাল মত চেনে অর্চনা। এর মত বেপরোয়া বন্ধু তার একজনও নেই। অথচ বেপরোয়া বলেই যেন তাকে ওর ভাল লাগে। এমন বেপরোয়া কজন হতে পারে?

অর্চনার বাড়ীর কেউই চকিতাকে পছন্দ করে না। অর্চনার পরের দু'বোন বলে, চকিতা আসলে পুরুষ। ওর কথাবার্তা সব পুরুষের মত।

অর্চনা অতটা ভাবে না, তবে চমৎকৃত হয়।

অর্চনা নিঃশব্দে চলে গেল ভাত যোগাড় করতে। টেবিলে কটি ফটো পড়েছিল। একই লোকের ভিন্ন ভিন্ন পোজের ছবি। কোনোটা সাহেবী, কোনোটা পাজামা পাঞ্জাবী পরা। বয়স আন্দাজ • চল্লিশ, চওড়া কপাল, চুল পিছন দিকে উলটিয়ে আঁচড়ানো, চোখে মোটা

কালো ফ্রেমের চশমা। মুখখানি লম্বাটে, স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সুপুরুষ বলেই মনে হয়। ছবিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল চকিতা। পুরুষের ছবি দেখলে তার ঠোঁটের কোনা একটু বেঁকে যায়. সেটা গিয়েছিল, অর্চনার ছোট বোন মূর্চ্ছা ঘরে ঢুকল।

বছর উনিশ বয়স মেয়েটির। পরণে সালোয়ার, কামিজ। কালোর মধ্যে দেখতে ভাল। অর্চনা যেমন মোটা, ফর্সা, ভারিক্কী, এ তা নয়। এর চেহারা একহারা, মুখখানি বেশ সাজায়। কালো মুখ, কিন্তু সাজলে অদ্ভুত জেল্লা খোলে। এর দুজনের বিপরীত আবার অর্চনার মেজ বোন টুকু, পুরো নাম টুকুমা। অর্চনা যেমন কথা কম বলে। স্বর নিচু, তেমনি মেজ বোনের একটু স্বর উঁচু, কথা বেশ সাজিয়ে সাজিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে। লোককে আঘাত করবে কথা দিয়ে। অথচ চীৎকার না বা কোন উচ্চগ্রামে নয়। সে জায়গায় মূর্চ্ছা অসম্ভব কথা বলে, আর বেশ জোরে। হেসে হেসে ইয়ার্কি করবে। জোরে হাসবে। সেই মূর্চ্ছা ঘরে ঢুকে চকিতার হাতে ছবিগুলি দেখে হেসে উঠল, ওগুলি কার ছবি বুঝতে পারছ চকিতাদি ?

চকিতা মূর্চ্ছার দিকে তাকাল। চোখে চোখ রেখে হাসল।

বুঝতে পারছ না ? মূর্চ্ছা দাঁত ঝিকিয়ে হেসে ঘাড় দোলাল। ও চুলে বয়কাট করেছে। আগে দোলা বিনুনি ছিল। ঘাড় দোলালে চুল দুলত। এখন ঘাড় দোলালে ঘাড়ই দোলে। চকিতা যতই সাহসী হোক, অর্চনার দু'বোনকে বেশ ভয় পায়। ওরা ঠেস দিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না। তাই একটু ভয়ের চোখে বলল, একজন সুপুরুষ ভদ্রলোক, আর তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সু-পু-রু-ষ তাহলে ! মূর্চ্ছা হেসে উঠল। তুমি তো আবা চকিতাদি পুরুষবিদ্বেষী।

চকিতা হাসল না। এই ফাজিলদের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও ভাল লাগে না। কেমন অপমান করে কথা বলে।

এই সুপুরুষ ভদ্রলোকের সঙ্গে দিদির সম্বন্ধ হচ্ছে।

চকিতা এখন চকিত হল। অর্চনার কাছ থেকে যেন এরকম কি

একটা শুনেছিল। লোকটি নাকি আগে একবার বিয়ে করেছে। দু'মাস বিয়ে। বৌ হঠাৎ ষ্টোভ বার্ষ্ট করে মারা গেছে। বাবার অফিসের অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার।

চকিতা শুনে বলেছিল, এঁটো মাল।

অর্চনা কথাটা বুঝতে পারে নি।

চকিতা বলেছিল, একটি মেয়ের সঙ্গে দু' মাস ঘর করেছে। তুই হলি দু' নম্বর। তাহলে লোকটা দুটো মেয়ে পেল। তুই পাবি একটা।

অর্চনা শুনে লজ্জা পেয়েছিল। —যাহ্ কি যে সব বলিস।

ঠিকই বলছি। আমরা মেয়েরা স্বামী মরলে আর বিয়ে করতে পারি না। কারণ দুটো পুরুষ আমাদের জীবনে পাপ। পুরুষের বেলা সে সব পাপ বর্তায় না।

অর্চনা চুপ করে গিয়েছিল।

এই ভদ্রলোকই তো তোমার বাবার অফিসে কাজ করেন।

মূর্চ্ছা হেসে বলল, ঠিকই ধরেছ। তবে তিনি বাবার অফিসে কাজ করেন না। বাবা তাঁর অফিসে কাজ করেন।

চকিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময়ে থালা হাতে অর্চনা ঘরে ঢুকল।

থালায় সাজান ডাল, ভাত, তরকারী, বেগুন ভাজা। টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলল, আজ মাছ হয়নি, তাই দিতে পারলাম না।

কিন্তু বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে থমকে গেল। চকিতার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বোনের দিকে তাকাল।

কিরে কখন এলি তুই? তোর না কলেজে সোশাল ছিল!

মূর্চ্ছা সে কথায় উত্তর না দিয়ে বলল, জানো দিদি চকিতাদি তোর বরকে সুপুরুষ বলেছে।

অর্চনার ভাল লাগলেও বোনকে ধমক দিল। —ফাজলামো করিস্ না তো!

বারে ফাজলামো কি করলাম। সুদীপ্তবাবু দেখতে সুন্দর, সে তো সকলেই বলে।

দাঁড়া বাবাকে বলছি, তোর বিয়েই ওর সঙ্গে দেব।

করছি যেন? মূর্চ্ছা ঠোঁট ওলটালো। বুড়ো বর বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। কি বলো চকিতাদি। ঠিক বলছি না!

চকিতা হাসার চেষ্টা করেও হাসতে পারল না।

মূর্চ্ছা চলে যাবার পরেও ছ'বন্ধুতে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রইল।

টেবিলের থালায় খাদ্যসামগ্রী। অর্চনা একবার তাকাল বন্ধুর দিকে। চকিতার দৃষ্টি নত। ও যে কিছু ভাবছে সেটা বোঝা যায়। অর্চনা মনে মনে একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকা তো যায় না। কিছু না কিছু কথা বলে আবহাওয়াটাকে সরল করতে হয়। তাই অর্চনা বলল, কি রে খেয়ে নেনা!

চকিতা অন্যমনস্কতা থেকে অর্চনার দিকে ফিরল। জানিস আমার চাকরী হয়েছে।

সত্যি! অর্চনার খুশীতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তোকে বলেছিলাম না একটা মেয়ে হোষ্টেলের কথা। কাল সেখানে একটু দেখা করতে যাব, আমার সঙ্গে যাবি!

তুই কি তাহলে সত্যিই ঠিক করে ফেললি, বাড়ী ছাড়বি!

কি করব বল্? বাবা অ্যাডাল্ট মেয়ের স্বাধীনতা মানবে না। আমি বিয়ে করব না, বাবা আমার বিয়ে দেবে।

বিয়ের কথায় অর্চনা নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ চলে আসবে বলে ভয় পেল।

কিন্তু সেটা বাঁচিয়ে দিল চকিতাই। প্রত্যেকের তো নিজস্ব একটা মতামত থাকে, থাকে না। তুই বিয়ে করতে চাইবি, করবি।

আমি চাই না, করব না। তাতে জোর করার কি আছে?

অর্চনা একটু মৃদু স্বরে বলল, তবু তো মাথার উপর গুরুজনরা আছেন। তাঁদের কথা তো একটু শুনতে হয়।

কে শুনতে চায় না। কিন্তু আমাদের মতামতও তারা একটু শুনবে না শুনবে না!

চকিতার রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে অর্চনা হাসল। এই সমস্যা নিয়েই তো জগৎ।

চুলোয় যাক জগৎ। অ্যাই হেট্ দ্যাট জগৎ।

তুই যে জগতের সব নিয়মকে হেট করিস সে তো আজ জানছি না। কিন্তু খাবার খাচ্ছিস না কেন?

কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। চকিতার ভেতরে তখনও রাগের ঝাঁজ ছিল, কিন্তু অর্চনার সহজ কথায় সব যেন কেমন তরল হয়ে গেল। সে খাবারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, অর্চনা কিছু মনে করিস না ভাই। খাবার আর মুড নেই।

খেয়ালী বন্ধুকে অজানা নয় অর্চনার। হেসে বলল, ভাত খাবি বলে চাইলি। কত কষ্ট করে রান্নাঘর থেকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দিলে হয়ত খেতাম; অনেক দেরী তো হয়ে গেল।

তুই সত্যিই পাগলী চকিতা। কখন যে কি মুডে থাকিস্।

সত্যি রে অর্চনা। আমি নিজেও জানি না কখন কি করে ফেলি।

তারপর একটু থামল। হঠাৎ হেসে উঠল একটা কথা ভেবে। জানিস্ অর্চনা!

অর্চনা মুখ তুলল। —আমি যেখানে চাকরী পেয়েছি, সেই নীলম বাজপেয়ী একটা নাম্বার ওয়ান বদমাইস।

অর্চনা আগ্রহী হল! লোকটা প্রথম দিন থেকেই আমার রূপে মুগ্ধ। আজ চাকরী দিয়ে হাতটা চেপে ধরল।

অর্চনা শিউরে উঠে বলল, তুই সব জেনে শুনে ওখানে চাকরী নিলি!

নিলাম!

যদি কিছু…। অর্চনা আসলে কথাটা সম্পূর্ণ করল না।

যে কোন পুরুষের কাছেই তো আমাকে কাজ করতে হবে। সব পুরুষই তো এক।

তবু জেনে শুনে…।

চকিতা একটু বিজ্ঞের মত বলল আমার মনে হচ্ছে, নীলম বাজ-

পেয়ীর নারীদোষ আমি ছাড়াতে পারব। লোকটা হামবাগ' কিন্তু শয়তান নয়। অর্চনার আতঙ্ক তবু গেল না। বলল, আমার তো শুনেই খুব ভয় লাগছে।

চকিতা বন্ধুর দিকে তাকাল। চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, সেইজন্যে তো তোর জন্যে সুদীপ্তর ব্যবস্থা হয়েছে। কোন ভয়. কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না, নিঃশব্দে নিজেকে বিলিয়ে দিবি।

অর্চনা অপমান গায়ে না মেখে নিঃশব্দে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

রাগ করলি ?

না রাগ করব কেন ? তুই যা পারিস্ আমি তা পারি না সে তো স্কুললাইফ থেকেই জানি।

হঠাৎ চকিতা উঠে দাঁড়াল। এই আমি চললাম, কাল তিনটের সময়ে হোস্টেল দেখতে যাব মনে রাখিস যেন।

অর্চনা তাকিয়েছিল বন্ধুর দিকে। দাঁড়ানোতে চকিতার সমস্ত দেহটা যেন তাকে সম্মোহিত করল। সেও নারী, তারও যৌবন আছে। একটু স্থূলমাপের শরীর বলে নারী ঐশ্বর্যের অনেক কিছুই স্থূল কিন্তু সে জায়গায় চকিতা যেন পুরুষের চোখে মূর্তিময়ী পাপ। এই শরীর দেখে কি কোন পুরুষ নিজেদের ঠিক রাখতে পারে ?

অর্চনার ঠোঁটে মৃদু হাসির খেলা দেখে চকিতা নিজের দিকে তাকাল। তার বুকের বাঁ পাশের কাপড় সরে গিয়েছিল। গোলাকার উত্তুঙ্গ স্তনের অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছিল। ব্রেসিয়ারের বাঁধন থাকলেও এত প্রকট যে চোখে না পড়ে যায় না! কাপড় না টেনে মুচকি হাসল।

অর্চনা লজ্জা পেল।

চকিতা বলল, লজ্জা পাচ্ছিস কেন ? এ তো আমাদের সম্পদ। এই দেখেই তো পুরুষরা মজে।

অর্চনা তখন নিজের কথা ভাবছিল। ওর যদি চকিতার মত এমন সম্পদ থাকত ? কিন্তু শরীরটা স্থূলের জন্যেই সবই তার স্থূল। অর্চনা

কথা না বলতে চকিতা একটু ঠোঁট টিপে হেসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। অর্চনা চকিতার বুকের আড়াল থেকে কুঁইকুঁই স্বরে বলল, আমি ভাবছি তুই কেমন করে নিজেকে রক্ষা করবি ?

চকিতা বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে চোখে হাসির জলতরঙ্গ নিয়ে ঘর ছাড়ল। ও যেন বিজয়িনী হবে এমনিভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অর্চনা অধোবদনে ভাবতে বসল।

৩

হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিসেস গোঙানি একটু রুক্ষ মেজাজের মহিলা। ওদের কোন পাত্তাই দিলেন না। চাকর দিয়ে বলে পাঠালেন, এখন দেখা হবে না। চকিতা চাকর দিয়ে বলে পাঠাল, কখন দেখা হবে ? তিনি জানালেন, এখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন, এক ঘণ্টার পর। ওরা এক ঘণ্টা পরে আসব বলে পথে এসে নামল। অর্চনা বলল, এখন কোথায় যাবি ?

চকিতা কিছু না বলে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুটা এগিয়ে সে থেমে পড়ল। সামনে একটা রেস্টুরেণ্ট কিন্তু ভেতরে বেশ ভীড়। চকিতা বলল, আয় এখানে চা খেয়ে সময়টা কাটাই। অর্চনার ইচ্ছে নয় ওখানে ঢোকার। বলল. ওখানে কি যাবি ? দেখছিস না ভেতরে কী ভীড়।

ভীড় তো কি হয়েছে ? আমরাও গিয়ে ভীড় বাড়াব।

কতকগুলি ছেলে রয়েছে না !

চকিতা হাসল, ছেলে রয়েছে তো কি হয়েছে ?

নাহ্, তুই বুঝছিস্ না চকিতা। অর্চনা বিরক্ত হল। ওরা আমাদের দেখবে না !

চকিতা আরও জোরে হাসল. দেখলে কি হয়েছে ? খেয়ে তো

ফেলবে না।

অর্চনা আরও বিরক্ত হল। শরীরের যেখানে সেখানে চোখ দেবে?

দিক্ ক্ষয়ে যাবে না।

না ভাই, আমি অতো বেপরোয়া হতে পারব না। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগবে।

চকিতা গম্ভীর হয়ে অর্চনার পিঠে ফেলা আঁচলটা তার কাঁধের পাশ দিয়ে বুকে টেনে দিল। এবার তে. আর অস্বস্তি হবে না।

অর্চনা সত্যিই আঁচলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সভ্যভব্য হল। তুইও দিয়ে নে চকিতা।

চকিতা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসল। আমি তোর মত ঠাকুমা হতে পারব না।

কিন্তু তোর দিকে তো ওরা তাকাবে।

ঠোঁটে হাসি নিয়ে চকিতা বলল, আমি ওদের তাকাবার জন্যে আরও গায়ের কাপড় খুলে দেব।

এই ভাই না না।

আচ্ছা, আচ্ছা চল্ তো!

ওরা ঢুকতেই ঘরের কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। রেস্টুরেন্টের প্রধান মালিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরে কোন সিটই খালি ছিল না। মেয়েদের আলাদা বসবারও জায়গা নেই। এক কোণে দুটো সিট জোড়া করে আট দশ জন যুবক বসে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ওদের দেখে আলোচনা থেমে গেল। সব কটা চোখ এদিকে।

চকিতার সামনের দুটো সিট হঠাৎ খালি হয়ে গেল। টপ করে চকিতা বসে পড়ে অর্চনাকে টানল। অর্চনা খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কাপড়ে টান পড়তে সে চম্‌কে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত-পাথরের টেবিল একটা ছোকরা মুছে দিয়ে গেল। বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

দু কাপ চা খেয়ে এক ঘণ্টা কাটানো যাবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে কচুরি, সিঙারা, সন্দেশ, রসগোল্লা অনেকে খাচ্ছে। চকিতা বলল, কি খাবি বল্ অর্চনা ?

অর্চনা চাপা স্বরে বলল, এখানে কি খাব, দু কাপ চা বল্ না! চা খেলে এক ঘণ্টা কাটানো যাবে! হঠাৎ চকিতার চোখে পড়ল একজন মধ্যবয়সী লোক ডাল, কচুরী খাওয়া ছেড়ে চকিতার দিকে তাকিয়ে আছে। ডিসে হাত কিন্তু দৃষ্টি চকিতার দিকে। চকিতা ঠোঁটে হাসি ভেঙে চোখ দিয়ে অর্চনাকে সামনের দিকে দেখাল।

অর্চনা দেখেই চাপাস্বরে বলল, আমার ভাই গা কাঁপছে। তুই উঠে চ।

বেয়ারা ছেলেটা অর্ডারের জন্যে তখনও দাঁড়িয়েছিল, মুখে বিরক্তি। চকিতা বলে দিল, দুটো করে কচুরি দু জায়গায় দাও, তারপর চা আনবে।

ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে এই হয়েছিল, কোলাহল থেমে গিয়েছিল। আবার কোলাহল ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। এবং সে কোলাহল ঐ আট দশ জন উনিশ কুড়ি বছর বয়সের যুবকদের কাছ থেকে। সবাই এক একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

হঠাৎ একটা জোরালো মন্তব্য ছুটে এল। মাইরী হেমামালিনী। না' না জিনত আমন। কেউ যেন বলল, মরে যাব।

অর্চনা বেশ রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। চকিতাকে ঠেলা দিল, আমার ভীষণ ভয় করছে।

চকিতার ওসব হচ্ছিল না, সে গম্ভীর থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ঠোঁটে হাসি ভাঙছিল। তার দিকেই অনেক চোখ। ওপাশের যুবকদের মধ্য থেকে কে যেন চোখ টিপল।

তার চোখে বড় করে চোখ রাখতে সে চোখ সরিয়ে নিল। মনে মনে চকিতা আবার হাসল। মনে মনে বলল, এক ফোঁটা সব দুধের বাচ্চা। গলা টিপলে সে দুধ বেরিয়ে আসবে মেয়ে দেখে লাফাচ্ছে।

এই সময়ে ডাল কচুরি এসে গেল। চকিতা বলল, নে অর্চনা

আরম্ভ কর। কুড়ি মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে।

অর্চনা চাপাস্বরে বলল, আমার গলায় ঢুকবে না, তুই খেয়ে নে।

চকিতা বন্ধুর দিকে তাকাল। অর্চনা তখন সত্যিই ঘামছিল ওর কপাল, চিবুক, গোটা গালে বেশ ঘাম। চকিতা অবাক হয়ে বলল. কি রে অর্চনা এত ঘামছিস কেন?

অর্চনা চাপাস্বরে উত্তর দিল, সব লোক কেমন চেয়ে আছে দেখছিস না।

তাতে কি আছে? দেখবার জিনিস দেখছে। আমাদের ভগবান কেমন তৈরি করেছেন বল্‌তো।

অর্চনা ধমক দিল, তুই আর ইয়ার্কি মারিস্‌ না তো!

বাহ্‌, তাহলে কি করব? কাঁদতে বসব। না ঐ চোখুদের বললো, ওগো তোমরা আমাদের দেখ না, চোখ নামিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে যাও

মাঝে মাঝে মন্তব্য কানে আসতে লাগল। কিন্তু একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল, সবাই যেন কেমন ভদ্র ও পবিত্র হয়ে যাচ্ছিল চকিতা নির্বিঘ্নে ডাল কচুরি খেল, চাও খেল কিন্তু অর্চনা আধখানা কচুরি ছাড়া আর কিছু খেল না। চায়ের পুরো কাপই পড়ে রইল হাত ধুতে বেরিয়ে গেলে সেই আট দশটি যুবকের পঙ্গপালের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

চকিতা বেসিনে হাত ধুয়ে ওদের সামনেই বেশ সাহস করে দাঁড়াল ওরা আগে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল, চকিতা দাঁড়াতে ওর চোখ নামিয়ে নিল। যেন সব সুবোধ বালক। চকিতার ইচ্ছে হচ্ছিল কিছু বলে কিন্তু ইতর শ্রেণীর যুবক দেখে মুচ্‌কি হেসে চলে এল।

পথে নামতেই অর্চনা গায়ের আঁচল পিঠে ফেলে বলল, বাপ্‌স।

চকিতা বলল, কি হল রে অর্চনা?

তুই এক এক সময়ে যা বিপদে ফেলিস্‌।

তোকে বিপদে ফেললাম, না ঐ রেস্টুরেন্টের লোকগুলোকে বিপদে ফেললাম।

তার মানে? অর্চনা অবাক হয়ে জানতে চায়।

চকিতা ঠোঁটে হাসি ভেঙে বলল, ঐ বুড়ো মালিক পর্যন্ত কেমন পয়সা গুণতে ভুলে যাচ্ছিল দেখলি না !

যাহ্ !

সত্যি বলছি। ক্যাশ কাউন্টারে একটা গোলমাল তোর কানে এল না ! একজন বেশ জোরালো গলার খদ্দের মালিককে কেমন ধমকাচ্ছিল।

যাই হোক ভাই এভাবে তোর ঐ রেস্টুরেন্টে ঢোকা উচিত হয়নি।

চকিতা উত্তর না দিয়ে দ্রুত পা চালাল। হোস্টেলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কেন মনে নেই আমাদের কলেজের সামনের রেস্টুরেন্টের কথা। দোকানের মালিক ছিল এক উড়িষ্যাবাসী। আমরা দোকানে যতক্ষণ থাকতাম কিরকম করত।

মালিকের কথা মনে পড়তে অর্চনা দাঁত বের করে হেসে উঠল; হ্যাঁ মদন না কি নাম ছিল। যেন মদনমোহন। কেমন সুর করে কথা বলত, দিদিমনি কতোদিন পরে আপ্নি এলেন। শলীল টলীল কি খালাপ হয়ে ছেলো।

দুজনে হাসতে হাসতেই হোস্টেল কম্পাউণ্ডে ঢুকল। এটি একটি প্রাইভেট হোস্টেল। কোন এক গুজরাটির টাকায় চালিত হয়। নীচে ওপরে আটখানি ঘরে বত্রিশ জন সার্ভিস গার্ল বোডার।

সুপারিণ্টেনডেণ্ট আপিস ঘরে ছিলেন। বেঁটে কালো মোটা গম্ভীর মহিলা। ঘরে ঢুকতেও তাকিয়ে দেখলেন না। বিরাট বড় টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন। এপাশে টেবিল ঘিরে তিন দিকে দুখানি চেয়ার। চকিতা অর্চনাকে ইশারা করল বসে পড়তে। অর্চনা কোন শব্দ না করে নিঃশব্দে গিয়ে বসল। চকিতা কিন্তু তা করল না, বেশ শব্দ করে যেন চেয়ারকে আছাড় দিয়েই ধপাস করে শব্দ করে বসল।

মহিলা একটা খাতায় এক মনে কি যেন লিখছিলেন, শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

এপাশে ওরা নিঃশব্দে বসে রইল। প্রায় পাঁচ মিনিট চলে গেল কিন্তু মহিলা কোন উচ্চবাচ্য করে না দেখে চকিতাই গলা খাঁকরি দিল। শুনছেন. এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ?

মহিলা কাজ করতে করতে গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, কোন সার্ভেণ্ট আমার নেই।

অর্চনা চকিতার দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকাল। চকিতা কিন্তু অন্য মতলব ভাঁজছে। সে শুনেছিল এই মাদ্রাজী, খৃষ্টান মহিলাটি একটু বেয়াড়া ধরণের।

বেয়ারাকে শায়েস্তা করার মত ক্ষমতা চকিতার আছে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের বাথরুমটা যেন কোন্ দিকে?

মহিলা খাতা থেকে চোখ তুলে চকিতার দিকে তাকালেন। একটু রূঢ়স্বরে বললেন, আপনারা কি এখানে ইয়ার্কি করতে এসেছেন?

চকিতা কিন্তু রূঢ় জবাব দিল না। বরং লজ্জার স্বরে বলল, আমার বাথরুমটা একটু বেশি দরকার হয়। অনেকক্ষণ এসেছি তো!

এটা তো ডিজিজ্, ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে ফেলুন।

না মিসেস গোঙানি, এটা আমার ছোটবেলা থেকে অভ্যেস।

থাকবেন কে আপনি নিশ্চয় নয়!

চকিতা কথাটা ঠিক ধরতে পারল না। বলল, কি বললেন?

মিসেস গোঙানি কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন।

না, না, আমিই থাকব।

তাহলে তো সিট দিতে পারব না। আমার সাফিসিয়াণ্ট বাথরুম নেই।

চকিতা দেখল নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে। কিন্তু ওর উপস্থিত বুদ্ধি খুব কাজ করে। সে বলল, না না বাথরুম বেশি দরকার আমার এই বন্ধুর। ওদের তো নিজেদের বাড়ী, অনেক বাথরুম আছে।

মহিলা কথায় ভিজল বলে মনে হল না। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সার্ভিস গার্লদের সম্বন্ধে বিরাট বক্তৃতা দিলেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটা করেছি আন্ম্যারেড সার্ভিস গার্লদের জন্যে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়েরা গোপনে বিয়ে করে এখানে আন্-ম্যারেড নাম লেখান। তারপর ভিজিটরদের আনাগোনা বেড়ে যায়। আরে বাপু, তোমরা যদি ম্যারেডই হও ফ্ল্যাট ভাড়া করে হ্যাসব্যাণ্ডের

সঙ্গে থাকো; এখানে এসে ঝঞ্ঝাট কর কেন ? আমরা নিরাশ্রয় কুমারী মেয়েদের থাকবার জন্যে হোস্টেল খুলেছি।

এই বক্তৃতার মধ্যেই চকিতা বলে উঠল। আপনি ভাল করে খোঁজখবর করে সিট দেন না কেন ?

মহিলা বক্তৃতা থামিয়ে চকিতার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। প্রচণ্ড কালো মুখে বিরক্তির রেখা ফুটেছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরে চকিতার সর্বঅবয়ব জরিপ করলেন। তারপর খুব মৃদুস্বরে বললেন, আপনি যে ম্যারেড নয় কি করে বুঝব ?

চকিতা একটু অপ্রতিভ হল, বলল, তা সত্যি কথা। কথার ওপর বিশ্বাস করতে হয়। তবে আপনি এই শুনে খুশী হবেন , আমি পুরুষের অধীন হতে চাই না, ম্যারেডকে হেট করি।

মহিলা যেন একটু খুশী হলেন। তবে মুখখানি এমন থ্যাবড়া ও কালো যে খুশি, বিরক্তি কোন কিচ্ছুরই রেখা পড়ে না। তবে কথা বলতে স্পষ্ট হল, চকিতাকে বেশ ভালভাবে জরিপ করে বললেন, আপনি সত্যি কথা বলছেন ?

মিথ্যে কিনা এই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন। এর তো এই মাসে বিয়ে। আমার বাড়ীতে বিয়ে দিতে চেয়েছে বলে আমি বাড়ী ছেড়ে হোস্টেলে আসছি।

মহিলা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, সবটা সত্যি কিনা জানি না। তবে আপনার মত কোন মেয়ে বলেনি ম্যারেডকে আমি হেট করি। বরং বলেছে কোনদিন ম্যারেড হলে হোস্টেল ছেড়ে দেব। আমাদের ফর্মে একটা কলম আছে না ?

হঠাৎ মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। কাকে যেন ডাকলেন। আগে বলেছিলেন কোন সার্ভেন্ট নেই, এখন দেখা গেল সেই আগের লোকটি। তাকে কি বললেন সে মাথা নাড়ল। তারপর মহিলা তাদের নিয়ে ওপরের সিঁড়ি ধরলেন। লম্বা একটা লন পার হতে হতে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজার মাথায় লেখা আছে আট নম্বর। কিন্তু দরজাটা বন্ধ। কড়া নাড়লেন। কয়েকবার কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে

বিরক্ত হলেন। এবার মোটা থাবায় দরজায় জোরে জোরে থাবড়া দিতে লাগলেন।

ভেতর থেকে বেশ জোরে সাড়া এল, কে কে কে?

আমি সুপার মিসেস গোঙানি।

কি দরকার আমি এখন ঘুমচ্ছি, পরে দেখা হবে।

এবার সুপার গলা ভারী করলেন, মিস সুজাতা মল্লিক, আমি বলছি দরজা খুলুন।

ভেতর থেকে আবার শোনা গেল, মাগীটা এই দুপুরবেলা জ্বালাতে এল। আরও একটু পরে দরজা উন্মোচিত হল। দেখা গেল যে দরজা খুলেছে সে একটি ছিপছিপে অল্প বয়সের মেয়ে। বোধ হয় শরীরে কোন পোষাক না রেখে ঘুমচ্ছিল। দরজা খুলতে হয়েছে বলে শায়াটা কোনরকমে গলিয়ে বুকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মিসেস গোঙানি এসব ব্যাপারে দেখা গেল বেশ ধৈর্যশীলা। গম্ভীর হয়ে বললেন, মিস মল্লিক এখন দুপুর নয় বিকেল পাঁচটা। আপনি কাপড়টা পরে নিন আমরা বাইরে দাঁড়াচ্ছি বলে দরজার কাছ থেকে সরে এলেন। চকিতা ও অর্চনা সরে এল।

মহিলা সরে এসে চাপা স্বরে বললেন, নটি গার্ল, কোন সার্ভিস করে না। মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে লোক ধরে রোজগার করে আনে।

চকিতা চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এসব ইনফরমেশন কি করে পান!

মহিলা ঠোঁটে বিজ্ঞের হাসি নিয়ে বললেন, ইনফরমেশন যোগাড় করতে হয় না। এখানকার বোর্ডাররাই খবরটা সাপ্লাই করে যায়।

সুজাতা মল্লিক উঁকি মারল, মিসেস গোঙানি!

ওরা তিনজনেই পর পর ঘরে ঢুকল। আটবাই আট সাইজের ঘর। চারকোণে চারটে তক্তোপোষ। চার দেয়ালে দড়ি খাটানো তাতে কাপড় জামা রাখা হয়। ছোট ছোট চারটে ঘুলঘুলি। তাতেপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর। পেষ্ট, তেল, ব্রাশ, সাবান। কোন টেবিল চেয়ারের

বালাই নেই। আনলেও রাখবার উপায় নেই। চারখানি সিঙ্গেল চৌকি পাতার পর শুধু চলার জন্যে এক ফুট করে জায়গা খালি আছে।

এ ঘরে যে সুজাতা ছাড়া কেউ নেই বোঝা গেল। গোঙানি মোটা মানুষ, তার ঐ এক ফুট দিয়ে চলতে গিয়ে বেশ অসুবিধে হল। উত্তরে একটি জানলা ছিল সেটা বন্ধ। জানলাটি খুলতে গিয়ে গোঙানি সুজাতাকে প্রশ্ন করলেন, জানলাটা বন্ধ রেখেছেন কেন?

সুজাতা তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল, কেন রেখেছি জানেন না! মেসবাড়ী থেকে লোকগুলো ঘরের মধ্যে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝাঁপিয়ে পড়বে কেমন করে শিক আছে না!

সুজাতা মল্লিক অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিল, শরীর দিয়ে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে, চোখ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাতে আপনার কি ক্ষতি হয়?

সুজাতা বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি তো ইয়াং নন, ইয়াং হলে অসুবিধা কি বুঝতেন?

ইয়াং নয় কথা বলতে বোধ হয় প্রবীণা সুপারের প্রাণে খোঁচা লাগল। বেশ টেনে টেনে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, ইয়াং আছেন বলেইতো এ ঘরে থাকতে আপনার সুবিধে হয়েছে। কাস্টামার ধরতে পথে পথে ঘুরতে হয় না।

মিসেস গোঙানি!

ধমক খেয়ে মিসেস গোঙানি এতটুকু নম্র হলেন না, বললেন ধমকাবেন না মিস মল্লিক। আপনাকে এ মাস নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, সিট ছেড়ে দিতে। আপনি এখনও দেন নি কেন?

পেলে চলে যাব। টাকা দিয়ে থাকি, অতো কথার কি?

এটা ওয়াকিং মেয়েদের হোস্টেল, তাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনাকে আবার ওয়ারনিং দিচ্ছি, পনেরো দিনের মধ্যে সিট ছেড়ে দেবেন। বলেই চকিতার দিকে ফিরলেন মিসেস গোঙানি। আর আশ্চর্য দেখা গেল, তিনি এতটুকু উত্তেজিত নন। নম্রস্বরে কোণের সিট দেখিয়ে বললেন, মিস চ্যাটার্জি ঐ সিটটা আপনি নেবেন। বলে গট গট করে

জুতোর শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চকিতা সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, উইথ ইয়োর পারমিশন জানলাটা খুলব?

সুজাতা মল্লিক কোন উত্তর দিলেন না, অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। চকিতা অর্চনার দিকে তাকাল, অর্চনা ইসারা করল, চল চলে যাই।

চকিতা চোখ দিয়ে তাকে থামতে বললো। তারপর আবার সুজাতাকে ডাকল, মিস মল্লিক, আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন না!

মুখখানি যে পাশে ঘোরানো ছিল, সেদিকে ঘুরিয়ে সুজাতা উত্তর দিল, আমার পারমিশনের কি দরকার, আপনার যা খুশি হয় করুন।

চকিতা জানলা না খুলে সুজাতার কাছে এগিয়ে এল, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি কি করেছি!

সুজাতা চুপ।

বারে নতুন আসব, এক ঘরে থাকব। ভাব না থাকলে কি চলবে? চকিতা খুব ধূর্ত টাইপের মেয়ে। এখানে তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত জানে। তার ধূর্ততায় কাজ হল। সুজাতা মল্লিক চকিতার দিকে তাকাল।

না আপনার কি দোষ! তবে আমি খুব শীগ্র ছেড়ে দেব। আমার নামে মিসেস গোঙানি যা বললেন আপনি কি বিশ্বাস করলেন?

চকিতা হেসে মাথা নেড়ে বলল, একটুও না। কুমারী মেয়েদের নামে সবাই এমনি কথা বলে।

সুজাতা খুব খুশি হল, বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চা খাবেন?

চাতো আনতে হবে।

খাটের তলা থেকে ষ্টোভ বের করে সুজাতা দেখাল। আমার ঘরেই সব ব্যবস্থা করা আছে। বসুন।

চকিতা বাইরে বেরতে উদ্যত হয়ে বলল, আজ থাক্ ভাই। আমিতো আসছি চা পাওনা রইল।

নিচে নেমে ফর্ম ফিলাপ করে এডভান্স দিয়ে বেরিয়ে আসতে আরও কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগল।

বাইরের রাস্তায় চলতে চলতে অর্চনা বলল, তুই এখানে না এলেই

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY
88718
2.5.92
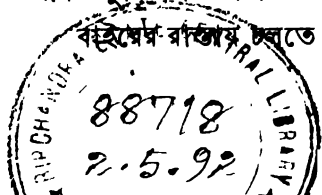
ভাল করতিস্ চকিতা।

কেন ?

যা সব এলিমেনটস্ দেখলাম।

কি এলিমেনটস্ ?

চকিতার হাসি দেখে অর্চনা একটু হতবুদ্ধি হল, ঐ সুজাতা মল্লিক, ঐ মিসেস গোভানি।

চকিতা দাঁত ঝিকিয়ে হেসে বলল, কেমন ম্যানেজ করলাম বলতো!

তুই পারিস।

পারিই তো। চলতে চলতে চকিতা বলল, দেখবি আমি ঐ সুজাতা মল্লিককে আমার আণ্ডারে নিয়ে আসব।

ওরা বাস না ধরে একটা ট্যাক্সির জন্যে ইতস্তত তাকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে চকিতার সামনে থামল।

আরে এই যে চকিতা, আমি তোমাদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম।

কেন পরমেশ্বরদা ?

সিরিয়াস্ একটা গোলমাল হয়েছে। আমাদের দলের একটা ছেলে শ্যামলকে খুব মেরেছে। তিন চার জায়গায় ফ্যাকচার। বাঁচবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

কোথায় আছে ? চকিতা ভয়জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের আর এক বন্ধুর বাড়ীতে।

হাসপাতালে দাওনি কেন ?

তোমাদের খবর না দিয়ে কি করে দিই।

চলো দাদাকে আগে দেখি। চকিতা দরজা খুলে উঠতে উঠতে অর্চনাকে বলল, তুই কি যাবি ?

যাওয়া তো উচিৎ কিন্তু ·····।

যাক্ তোকে যেতে হবে না, তুই বাড়ী যা।

অর্চনার সামনেই গাড়ীটা স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেল।

পরমেশ্বর, কাজল, দীপঙ্কর, অর্ণব, প্রণব এই পাঁচজন মোটামুটি শ্যামলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরা বহুবছর ধরে এক সূত্রে গাঁথা আছে। সেই

কলেজ জীবন থেকে। সকলেই কৃতি। শ্যামলের মত কেউ কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ কেউ লইয়ার, চাটার্ড। তবে কিছুকাল ধরে তারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাদের বক্তব্য রাজনীতি ছাড়া বাঁচা যায় না। জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও, তবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাও। সেইজন্যে তারা দুদলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সক্রিয় রাজনীতিই তারা করে। সেই সক্রিয়তার জন্যে বন্ধুত্বের সাথে সাথে কখনও কখনও বৈরতা এসে যায়।

চকিতাও দেখেছে, তাদের ড্রইং রুমে সব বন্ধু মিলে কি তর্ক। সেই তর্কের সাথে কখনও কখনও কে কাকে সরিয়ে দেবে সেই নিয়ে বক্তব্য জোরালো হয়। চকিতা ওদের কথা শুনে শিউরে উঠেছে। ও দেখেছে আজকে রাজনীতি মানে জঘন্য হানাহানি। মাঝে মাঝে সেইজন্য দাদাকে ওদের অসাক্ষাতে প্রশ্ন করেছে, দাদা তোরা এই রাজনীতি করে কি পাস্? আমি তো তোদের কথাবার্তা শুনে বুঝি, তোরা সব এক একজন খুনের আসামী হয়ে উঠছিস্।

শ্যামল বোনের কথায় চোখ নাচিয়ে বলে, ঠিকই ধরেছিস্। আজকের রাজনীতি মানে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। যে যত বেশী বুদ্ধি খাটিয়ে অ্যাকশন্ আনতে পারবে সেই সাফল্যটা কবজা করবে। ফুটবল খেলা দেখিস্ নি! যে যত বেশী গোল করে সেই ম্যান্ অফ দ্য ম্যাচের শিরোপাটা পায়।

তাই পরমেশ্বরের কথা শুনে চকিতা বিস্মিত হল না। বহুদিন ধরে অনুমান করছিল এরকম একটা চক্রান্তে দাদা কোন না কোন সময়ে পড়বে।

উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী এগিয়ে চলেছিল। চকিতা কিছুটা উদ্বিগ্ন। পরমেশ্বর ওপাশে বসে নির্বিঘ্নে সিগারেট টানছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাপও এঞ্জিনিয়ার, ছেলেও তাই। বিয়ে করেনি। তবে মেয়েদের ওপর আকর্ষণটা প্রবল। একসময় একটা মেয়ের ওপর বলপ্রয়োগ করতে মামলা হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলই মধ্যস্থতা করে সে মামলা মেটায়। অনেকক্ষণ পরে চকিতা বলল, দাদার ওপর যখন

অ্যাকসান্ হয়, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ?

পরমেশ্বর কি একটা উত্তর দিল। গাড়ীর ঘর্ষণে কানে ঢুকল না। চকিতা মুহূর্তে পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। পরমেশ্বরকে দেখলেই কেমন যেন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এক একজনের দৃষ্টি আছে না, মেয়েরা ছেলেদের সে দৃষ্টি দেখে ঠিক বুঝতে পারে, ওরা কি চায় ? চকিতাও জানে পরমেশ্বরের মনোভিপ্রায়। কিন্তু ও এ সব ব্যাপারে খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা চকিতার আছে। যেদিন থেকে তার শরীরে যৌবন এসেছে, সেদিন থেকে সে সতর্ক। পুরুষের চোখ যে তাকে কেবলি হাতছানি দেয় তার অজানা নয়। হঠাৎ পরমেশ্বরের কথায় গাড়ীটা ব্রেক করে থামল। গাড়ী থেকে নেমে ওরা একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। ছোট বাড়ী, একতলায় তিনখানি ঘর।

চকিতা জিজ্ঞাসা করল, এ কার বাড়ী ?

তুমি চিনবে না আমার এক বন্ধুর বাড়ী।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে দেখা গেল, কোন লোকজন নেই। চকিতা একটু বিস্মিত হল। পরমেশ্বর তাকে পথ দেখিয়ে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সেটা যে একটা বেডরুম দেখে বোঝা গেল। ঘরটি ছোট নয় অথচ খুব বড়ও নয়। সুন্দর করে সাজানো। ডবল বেডের হালফ্যাশন খাটের ওপর ডানলোপিলোর পুরু বিছানা। এপাশে এক জোড়া লাল রঙের সোফাসেট। পাশেই নানা ইংরিজী বইতে ঠাসা বুকসেলফ। সবুজ মোজায়েক করা ঘর। আলোর আভায় আরও সবুজ দেখাচ্ছে।

পরমেশ্বর বলল, বসো চকিতা।

চকিতা একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, দাদা কোথায় ?

আছে আছে বসো না। অত ব্যস্ত হবার কি আছে ? বলে পরমেশ্বর চকিতার পাশে বসল।

চকিতা পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারল। সে চোখ ধূর্ততায় মিটিমিটি জ্বলছে। চকিতা বুঝল সে পরমেশ্বরের

ফাঁদে পড়ে গেছে। কিন্তু চকিতা কি তার জন্যে ভয় পাবে?

পরমেশ্বর সিগারেট বের করে বাক্সে ঠুকে লাইটার দিয়ে জ্বালাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে চকিতার আরও কাছে সরে এসে মোলায়েমকণ্ঠে বলল, অনেকদিন ধরে সাধ ছিল তোমায় একদিন ভোগ করব। তোমাকে যে সম্পদ ভগবান দিয়েছেন, সে প্রাণভরে ভোগ করবার জন্য। অথচ শুনলাম তুমি ডিসিশান নিয়েছ। তুমি চাকরী করে একা জীবন নির্বাহ করবে। কোন পুরুষকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। এই শুনেই আমার পুরুষসিংহ গর্জে উঠল। আমি তো জানি মেয়েরা যতই আস্ফালন করুক। তারা একবার ঘাৎ হলেই সম্পূর্ণ পালটে যায়।

তুমি কি আমাকে ঘাৎ করবে বলেই এখানে নিয়ে এসেছ?

ইয়েস্ ম্যাডাম। তুমি খুবই বুদ্ধিমতী জানি। এই বাড়ীতে তুমি আমি ছাড়া কেউ নেই জানবে। তুমি যদি স্বইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে অভিনন্দন জানাও, তবে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কবুল করতে পারি। আমি যে বিবাহ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করব। এবং চকিতা চ্যাটার্জীকে চকিতা সিংহ করে নেব।

কিন্তু আমি তোমার ইচ্ছাকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছুক নয়।

তাহলে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেব।

তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি, তুমি এক ধর্ষণের কেসের আসামী ছিলে. দাদা তোমাকে বাঁচিয়েছিল।

এবারও তোমার দাদাই আমাকে বাঁচাবে। সেও ইচ্ছুক তার বোন এমনি একটা চক্রান্তের স্বীকার হোক।

বাজে কথা বলো না পরমেশ্বরদা। দাদা একথা বলতে পারে না।

পারে। বলে পরমেশ্বর পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। চিঠির নীচের কটা লাইন চকিতাকে পড়তে বললো। 'চকিতা বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ও চাকরী করে আলাদা থাকতে চায়। অথচ ও বুঝতে চায় না, একটা মেয়ে বিয়ে না করে আলাদা থাকতে পারে না। বেওয়ারিশ সামগ্রী যেমন লুটে পুটে খাওয়া যায়, ওরও

অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাই হবে।

চিঠিটা পড়ে চকিতা বিস্মিত হল। তার অজান্তে তাদের ফ্যামিলী এভাবে তার সম্বন্ধে ভেবে নিয়েছে। সে বিয়ে না করলে বেওয়ারিশ সামগ্রীতে পরিণত হবে। কিন্তু কেন? একজন পুরুষ সারাজীবন বিয়ে না করে থাকতে পারে? একজন নারী তা পারে না।

হঠাৎ তার চেতনা ফিরল তার পোষাকে টান পড়তে। চকিতা উঠে দাঁড়াতে গেল কিন্তু বলশালী পরমেশ্বর উঠতে দিল না। পিছন থেকে হাতের বেড় দিয়ে চকিতাকে চেপে ধরল। চকিতার উত্তুঙ্গ দুই বুকের ওপর পরমেশ্বরের হাতের থাবা। চকিতা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সরিয়ে নিতে গেল। দুজনে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। চকিতার শাড়ি মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপর গড়াতে লাগল। বুকের ব্লাউজের হুকগুলো স্থানচ্যুত হল। পরমেশ্বরের দৃষ্টি উল্লাসে নাচতে লাগল। পরমেশ্বর বলল, তুমি কতটুকু বলপ্রয়োগ করবে চকিতা!

চকিতাও হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, দেখনা আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা আছে কিনা!

পারবে না পারবে না। এই নারী সম্পদ। ঐ সুন্দর বক্ষ, এই ভরাট উরু, সুন্দর মসৃণ তলপেট সব আজ আমার সামনে উন্মুক্ত হবে।

উন্মুক্ত হচ্ছিলও। চকিতার অনাঘাত দুই বক্ষসুষমা প্রায় ব্রেসিয়ারের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সেখানে পরমেশ্বরের থাবা কবার পড়েছে। শাড়ীহীন হয়ে শায়ার ফাঁসও প্রায় আলগা। দেখা যাচ্ছিল শুভ্র মসৃণ তলপেট। পরমেশ্বর চকিতার দুই কোমল অধরেও হামলা করেছিল।

হঠাৎ চকিতার মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ অবস্থার ঝামেলায় ভুলে গিয়েছিল। তার যে সঙ্গে আত্মরক্ষার অস্ত্র সবসময়ে থাকে মনে ছিল না। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা খুলে একটা বন্ধ ছুরি হাতে তুলে নিল। একটি বিদেশী ছুরি। কোন এক বন্ধুর কাছে দেখে চেয়ে নিয়েছিল। ছুরিটার অনেকগুলি ফলা। প্রত্যেকটি ফলায় ভীষণ ধার।

এটা সবসময়ে চকিতার ব্যাগেই থাকে। ব্যবহার কখনও করে

নি। আজ সেটা এভাবে কাজে লাগবে দেখে খুশি হল। চক্‌চকে ফলাটা বের করে পরমেশ্বরের দিকে ধরতে সে আতঙ্কে বলল, একি তুমি খুন করবে নাকি চকিতা ?

চকিতা স্ফুরিত কণ্ঠে বলল, হাঁ। আত্মরক্ষার অধিকার সব মেয়েদের আছে। এবার সামলাও পরমেশ্বর। বলেই সে চকচকে ছুরি তুলে তীরবেগে এগিয়ে গেল পরমেশ্বরের দিকে।

প্রাণভয় সবার আছে। যদি ঐ ছুরিটা বুকের মধ্যখানে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই ভেবে আতঙ্কে নারীলোলুপ পরমেশ্বর ছুটে ঘরের অন্যপাশে চলে গেল।

চকিতা ওর কাণ্ড দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল। কেমন পরমেশ্বর? খুব শস্তা ভেবেছিলে না আমাকে ?

পরমেশ্বর দূর থেকে আতঙ্কে বলল, ওহ্‌ তুমি তাহলে ছুরি নিয়ে সব সবসময়ে ঘোর।

নিশ্চয়। তোমার দৌড়টা আমি দেখছিলাম। সোফার কাছা-কাছি ছুরিটা রেখে সে ত্বরিৎগতিতে শাড়ীটা পরে তৈরী হয়ে নিল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। যতক্ষণ না আমি চলে যাই এক পাও নড়বে না। নড়লে দেখছ তো এই ছুরির সবটা তোমার বুকে ঢুকে যাবে। আর পুলিশকে গিয়ে জানাবো, আত্মরক্ষা করার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে। চকিতা ছুরিটা হাতের মুঠিতে চেপে ধরেই ঘর ছাড়ল। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে খুব বেশি বিলম্ব হল না।

৪

জীবনলাল চ্যাটার্জী একজন অধ্যাপক মানুষ। দর্শনের ওপর অধ্যাপনা করেন। ঐ সাবজেক্টে কতকগুলি বইও লিখেছেন। সেগুলি ভাল চলে। জীবনলাল চ্যাটার্জী অর্থ, প্রতিপত্তি সবই করেছেন কিন্তু মানুষ হিসাবে বড়ই অহঙ্কারী। বাড়ীর মধ্যে যেমন বাইরে

তেমনি সব ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্বটা কাজ করে। কেউ তার কর্তৃত্ব না মানলে মুখদর্শন করেন না। নিজের দুই ভাইয়ের সঙ্গেও তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। জীবনলাল যেমন দাপটের লোক, সে জায়গায় তাঁর স্ত্রী মানসী ভীরু ও ভালমানুষ। সংসার করেন স্বামীর হুকুমে। স্বামী যা বলেন, পালন করাই যেন তাঁর কর্তব্য।

চকিতা ও শ্যামল সাত বছরের ছোট বড়। ওরাও ছোটবেলায় বাবার ভয়ে তটস্থ থাকত। পড়াশুনা সেইজন্যে বাবার ভয়ে হয়েছে। দুই ছেলেমেয়েকে ফিলোজফি নিয়ে পড়াশুনা করতে তিনিই উদ্বুদ্ধ করেন। চকিতা ফিলোজফি নেয় কিন্তু শ্যামল ত্যাগ করে। শ্যামল হায়ার এডুকেশন না নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসে ভর্তি হয়।

কিন্তু জীবনলাল চেয়েছিলেন, ছেলে তাঁর মত কলেজে পড়াবে। সে না হতে ক্ষেপে যান। সেদিনের কথা আজও মনে আছে। বাবা পরাজিত সৈনিকের মত দাদার অপেক্ষায় ঘরে পায়চারী করছেন। যেন সিংহ ক্ষেপে গিয়ে কেশর ফুলিয়ে তাকিয়ে আছেন। মা মাঝে মাঝে শুকনো মুখে উঁকি মারছেন। আর মনে মনে ডাকছেন, হে ঠাকুর ভালোয় ভালোয় সব শান্ত করে দাও।

এই সময়ে দাদা বাড়ী ঢুকল। চকিতা তাকে দেখেই চুপি চুপি বলল, বাবা রেগে টং হয়ে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

জানি। শ্যামল হাসতে লাগল।

চকিতা বিস্মিত হয়ে বলল, জানিস মানে?

জানি তো বাবা রেগে যাবে। বিদ্রোহ করেছি না!

শ্যামল গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াল।

জীবনলাল গর্জে উঠে বললেন, ব্যাপার কি? তুমি আমাকে অপমান করে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি হলে।

শ্যামলের চট্‌পট্ উত্তর: আমার কেরিয়ার তো আমাকেই বুঝে নিতে হবে। যা ভাল লাগে না আপনার হুকুমে সেদিকে এগোলে কি ফিউচার তৈরী হত?

স্পষ্ট উত্তর। জীবনলাল হাঁ হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কোনদিন কেউ তার কথার প্রতিবাদ করেনি, বরাবর নিজের ইচ্ছায় যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। এমন কি বৌও পেয়েছেন তাঁর অধীন।

বিয়ের পর পাঁচ বছর পর্যন্ত যখন ছেলেপিলে হয়নি, দায়ী হয়েছে মানসী। আর অত্যাচার করেছেন জীবনলাল। রোজ রাত্রে মানসীর ইচ্ছা না থাকলেও তাকে যন্ত্র হতে হয়েছে জীবনলালের বলপ্রয়োগে।

চকিতার জ্ঞান হবার পরও সে দেখেছে এই অত্যাচার। মা এসে তার ঘরে শুত। বাবা এসে মাকে নিয়ে যেত। মা অনুযোগ করত. আজ আমার বড় শরীর খারাপ। আজ আমায় রেহাই দাও।

দুটো ছেলে মেয়ের পরও কেন জীবনলালের এই যৌনতাড়না। বোঝা গেল ওরা যদি মরে যায় তাহলে বংশ রক্ষা করবে কে?

আসলে যে জীবনলাল অভ্যাসের দাস হয়ে গেছেন সে নিজেও জানেন না। এক একদিন রাত্রিবেলা মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চকিতার পাশে এসে শুয়ে পড়তেন। ভাবতেন বুঝি চকিতা ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু চকিতা না ঘুমিয়ে বাবার কাণ্ডটাই দেখত।

মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কি কোন দাম নেই? তখন কতই বা বয়স চকিতার। সেই বয়স থেকেই তার মধ্যে গড়ে উঠতে লাগল পুরুষের প্রতি অসম্ভব বিদ্বেষ। জীবনে কোন পুরুষকে সে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। বিয়ে থা না করে সে একক জীবন গ্রহণ করবে।

এটা সামাজিক ক্ষেত্রে খুবই নিয়মবিরুদ্ধ। মেয়ে বিয়ে করবে না এ হয় নাকি? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল চকিতা সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে।

চকিতার দোষ যেন মানসীর ওপর বর্তালো। মানসী যেন ষড়যন্ত্র করে মেয়েকে বিয়ে করতে মানা করছেন।

জীবনলাল মানসীর ওপর তড়পাল। তুমিই মেয়েটার মাথাটা খেয়েছ। বিয়ে করবে না এ কোন্‌দেশী কথা। মানসী সেকথা মেয়েকে বলেন, তুই বিয়ে করবি না, এ যেন আমি তোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

আজ চকিতা বড় হয়েছে। জীবনরহস্যের অনেক কিছুই তার কাছে স্পষ্ট। সে ঠোঁট জোড়া শক্ত করে বলে, বাবাকে বলতে বলো

না আমাকে। তিনি যে কথা শুনবেন আর কোনদিন বিয়ের কথা উচ্চবাচ্য করবেন না।

কেন কি এমন কথা রে! মানসী বিস্মিত হন।

তুমি মা যেন কিছুই জানো না। স্বামীর কতরকম অত্যাচার তুমি নীরবে মেনে নিয়েছ!

মানসী বুঝতে পেরে পালিয়ে যান। আজ এরা বড় হয়েছে, আর তো কিছু গোপন নেই তাদের কাছে। এখনও যে প্রত্যহ রাতে…।

চকিতা চাকরী করতে যাচ্ছে দেখে জীবনলাল আরও ক্ষিপ্ত হন! সেদিন ছেলেকে ডেকে বলেন,শ্যামল ব্যাপার কি। চকিতা চাকরী করতে যাচ্ছে!

হাঁ বাবা দেখছি তো!

আমি কি মারা গেছি, না সংসার চালাতে পারছি না।

ও তো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চাকরী নিয়েছে। আপনি তো চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

ওর তো বিয়ে দেবার জন্যে টাকা ফিক্সড্ করে রেখেছি।

ও চায় না বিয়ে করতে।

কেন?

সেকথা তাকেই জিজ্ঞেস করলে হয় না বাবা!

জীবনলালের কেমন যেন মনে হয় তিনি অপরাধী। চকিতাকে দেখতে পান, তবু কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পান না। আড়ালে গজরান।

মেয়েরা জীবনে প্রথম পুরুষ দেখে বাবাকে। বাবাকে ঘিরেই তাদের মনোরাজ্যে গড়ে ওঠে একজন ঈপ্সিত পুরুষ। বাবা যদি চরিত্রবান গুণবান হন, মেয়ের মনে গড়ে ওঠে তেমনি একজন পুরুষ। বাবা যদি, লম্পট, মাতাল, চরিত্রহীন হন, মেয়ের মধ্যে বাবার কায়ারূপ একজন এসে ভয় করে। মনে মনে একটা আতঙ্ক থেকেই যায়। চকিতার মধ্যে যে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ মায়ের প্রতি বাবার আচরণের জন্যে এ আর বলে দিতে হয় না। তবে বাবার চেয়ে গুণবান চরিত্রবান

পুরুষ কি পৃথিবীতে নেই ? আছে নিশ্চয়ই. কিন্তু চকিতা তার দেখা পায় নি।

সেদিন পরমেশ্বরের কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে বাড়ী এসে দেখল দাদা আছে বাড়ীতে। শ্যামলের ঘরে সরাসরি ঢুকে বলল চকিতা, তুমি আমার ঘরে আসবে না, আমি তোমার ঘরে আসব।

বোনের চেহারার অবস্থা দেখে শ্যামল প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তোর এ কি অবস্থা হয়েছে চকিতা ?

সে সব কথা পরে বলবো। আমার কথার জবাব এখনও পাইনি। বোনের কঠিন চেহারার দিকে তাকিয়ে শ্যামল তাড়াতাড়ি বলল, না, না আমি তোর ঘরে যাচ্ছি। তুই বাইরের কাপড় চোপড় ছেড়ে নে।

চকিতা চলে গেলে শ্যামল ভাবতে লাগল, কি এমন মারাত্মক ঘটনা, যার জন্যে চকিতা এখনি রূঢ় হয়ে উঠেছে ! তবে বোন যে মাঝে মাঝে খুবই রূঢ় হয় তার অজানা নয়।

একটু সময় বিলম্ব করেই সে চকিতার ঘরে গেল। দেখল সে তখনও কাপড়চোপড় ছাড়েনি, চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছে।

শ্যামল দেখেই বিলম্ব না করে পিছন ফিরতে ফিরতে বলল, তুই এখনও রেডি হোস্ নি। রেডি হয়ে নে, আমি একটু পরে আসছি।

না পরে আসতে হবে না। তুমি ঐ সামনের চেয়ারটায় বসো। শ্যামল বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সুবোধ বালকের মত নির্দেশ পালন করল। চকিতার সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, বল্ তোর কি বলার আছে ?

একটি কুমারী যুবতী মেয়ের ঘর। একটি সিঙ্গেল খাট। পুরু বিছানা। শান্তিনিকেতনী বেডকভার দিয়ে ঢাকা। একটি মাথার বালিশ, একটি পাশবালিশ। পাশে একটি স্টিলের আলমারী, তার পাশে একটি আলনা। আলনায় কখানি কাপড়, জামা, শায়া। এপাশে একটি ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে প্রসাধন সামগ্রী। তারই পিছন দিকে দেয়াল সেলফে অনেক বই। অধিকাংশ কলেজ পাঠ্য, তার সঙ্গে কিছু গল্পের বই। ঘরে দুখানি চেয়ার ছিল, একটিতে চকিতা বসেছিল,

অপরটিতে শ্যামল। এ ঘরে আগে মানসী শুতেন। চকিতা বড় হবার পর তিনি পাশের একটি ছোট ঘরে শোন। যেটা আগে ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত।

তুমি আমাকে বেওয়ারিশ মনে কর?

হঠাৎ দুম্ করে এই কথা বলতে শ্যামল ঠিক বুঝতে পারল না।

হঠাৎ এই কথা?

আগে এ কথার জবাব দাও, তারপর বলছি। চকিতা স্থিরদৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্যামল আমতা আমতা করে বলল, ঠিক কোন্ সেন্সে জিজ্ঞাসা করছিস, বুঝতে পারছি না।

সেন্স যাই হোক্।

মেয়েরা বিয়ে থা না করলে এই অর্থই কি বোঝায় না?

ও তাহলে তুমি আমাকে বেওয়ারিশ মনে কর?

তুই চট্‌ছিস কেন? হঠাৎ এ কথাই বা এলো কেন? শ্যামল জানতে চাইল।

তোমার ঐ হঠকারিতার জন্যে তোমার বন্ধু পরমেশ্বর কি করেছে জানো? বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে চকিতা আদ্যোপান্ত সব বলে গেল।

সব শুনে শ্যামল একটু গুম্ হয়ে বসে রইল। তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তোকে বিপদে ফেলবে পরমেশ্বর সেই চিন্তা করে নিশ্চয় ঐ কথা বলিনি।

কিন্তু তুমি এমন জঘন্য কথা বোনের সম্বন্ধে বলবেই বা কেন?

শ্যামল হাসবার চেষ্টা করে বলল, সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে তো সকলে এই কথাই বলে। তুই বরং চকিতা একটা বিয়ে করে নে। তাহলে ওসব কথা কেউ বলবে না।

তাহলে তোমরা বলতে চাও, মেয়েরা একজন কারুর খাঁচায় না ঢুকলে তাদের ঐ নাম নিতে হয়।

ঠিক তাই চকিতা। শ্যামল একটু কোমল হতে চাইল। আমাদের

সমাজব্যবস্থা যে ধরণের। মেয়েদের নানান বদনাম রটে যায়।

আমি বদনামের কিছু না করলেও আমার বদনাম রটে যাবে!

জানছে কে তোর কোন বদনাম নেই। তুই এক যুবতী সুন্দরী মেয়ে, হাজার প্রলোভনের ফাঁদ পাতা আছে।

ও! তোমরা অনুমানে আমার বদনাম ছড়াবে!

তুই ঠিক বুঝতে পারছিস্ না?

থাক্ তোমার অনেক উপদেশ শোনা হ'ল। এবার তুমি এসো। চকিতা ছিটকে উঠে ঘরের অন্যত্র চলে গেল।

শ্যামল বোনের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়েও এক কুমারী অনূঢ়া মেয়ে নানান কথা ভাবতে লাগল। বেশ মজাদার এ পৃথিবী। একটা মেয়ে কোন পুরুষের অধীনে থাকতে চায় না। তবু সমাজ তাকে থাকতে দেবে না। কেমন ধরণের এ সমাজ? সে পবিত্রই থাকবে। কোন নোংরাকে প্রশ্রয় দেবে না। তবু তাকে অযথা দুর্নাম নিতে হবে।

আর দুর্নামের জন্যে তার এই লোভাতুর শরীরটাই শত্রু। সবাই যেন আঙ্গুল তুলে তাকে বলতে চায়। এই তোমার শরীর, তোমার যৌবন যে পুরুষের দৃষ্টির ক্ষুধা। তুমি ভোগ্য হবার জন্য জন্মেছ। তোমাকে ভোগ্য হতেই হবে। তোমাকে ভোগ করবার জন্যে সহস্র হাত বাড়িয়ে আছে। হঠাৎ চকিতা উত্তেজনায় উঠে বলল, না, না আমি কারও ভোগ্য হব না। আমি নিজেকে রক্ষা করব। কেন আজ পরমেশ্বরের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম না? কে যেন বলে উঠল, একবার করেছ, কতবার করবে চকিতা? এ যে ভীষণ নির্মম পৃথিবী। কোথায় তলিয়ে যাবে নিজেও জানো না।

চকিতা বালিশে মুখ ডুবিয়ে চোখের জলে ভাসতে লাগল।

সো এণ্ড সো কোম্পানীতে চকিতাকে বেশীক্ষণ কাজ করতে হয় না। ডিউটি ঠিক সময়ে দিতে হয় কিন্তু যে কোন সময়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এটা অন্য কারুর ক্ষেত্রে হয় না। নীলম বাজপেয়ী তাকে এই লিবার্টি দিয়েছেন। ওর পোষ্ট, পি-এ টু ডিরেক্টর বাজপেয়ী।

একটা এন্টিরুমে তাকে বসতে হয় কিন্তু যতক্ষণ অফিসে থাকে নীলম বাজপেয়ীর সামনে। নীলম হেসে বলেন, ঘরে যেমন দামী আসবাব থাকলে ভাল লাগে, তেমনি আমার ঘরের শোভা আপনি।

চকিতা শুধু হাসে। কোন জবাব দেয় না। আর অফিসের শোভা বলে নিত্য নতুন সেজে সে এখানে আসে। কাজ অবশ্য কিছু করতে হয় তাকে। নীলম ডিক্টেশন্ দেন, চকিতা তা গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে বিজনেস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা। এক্সপোর্ট, ইমপোর্টের বিজনেস। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় পার্টি হয়। নীলমের সঙ্গে চকিতাকে যেতে হয়। বড় বড় বিজনেসম্যানদের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। সেখানে দেদার ড্রিঙ্কস চলে। চকিতা ওসব স্পর্শ করে না। কার্টসির জন্য কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে ভদ্রতা বজায় রাখে।

নীলম প্রচুর ড্রিঙ্কস করেন। পার্টি থেকে ফিরতে রাত হলে নীলম চকিতাকে পৌঁছে দেয়। গাড়ীতে বসে নীলম বলেন, মিস চ্যাটার্জী আপনি ড্রিঙ্ক করেন না কেন?

চকিতা নীলমের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ড্রিঙ্ক করাটা কি চাকরীর সঙ্গে যুক্ত?

নীলম প্রচুর ড্রিঙ্ক করলেও মাতাল হন না। অপ্রতিভ হয়ে হেঁসে বলেন, নো নো মিস চ্যার্টার্জী। এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।

চকিতা লক্ষ্য করেছে, নীলম সঙ্গ চায়, কাছে বসতে চায়, হাত ধরতে চায় কিন্তু সম্ভ্রম বজায় রাখে। এই সম্ভ্রম যে কতদিন থাকবে তাই চিন্তা।

নীলমের একটা প্রাইভেট এপার্টমেণ্ট আছে। সেখানে মাঝে

মাঝে গিয়ে বিশ্রাম নেন। একদিন চকিতাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। প্রথমে বলেন নি কোথায় যাচ্ছেন। গাড়ী থেকে লিফট করে চারতলায় উঠে চাবি দিয়ে একটা ফ্ল্যাটের দরজা খোলেন। আলো জ্বালতেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ওয়েল ফার্নিস একটি ঘর। মেরুণ রঙের দামী সোফা সেট। সামনের ঘরে ডবলবেডের খাট। সোফায় বসে নীলম বলেন, আসুন মিস চ্যাটার্জী।

চকিতা সবই বুঝতে পারে। সাহসে ভর করে সে একটা সোফায় বসে।

এখানে আমি মাঝে মাঝে এসে রিলাক্স করি।

সে তো দেখেই বুঝতে পারছি।

চকিতা ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরের ওয়ালব্রাকেটে একটা ম্যাক্সি দেখতে পায়।

হেসে বলে, এটারও প্রয়োজন নিশ্চয় হয় ?

নীলম বলে, নিশ্চয়। ধরুন, আপনি যদি আজ এখানে থাকেন, তবে কি এটার প্রয়োজন হবে না ?

হাঁ হাঁ তা তো বটে। চকিতা হেসে ওঠে। তারপর কায়দা করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসে।

ওর এখনও বাড়ী ছাড়া হয় নি বলে লেডিজ হোষ্টেলেও আসা হয় নি। কিন্তু মাসের রেণ্টটা দিয়েছে বলে সময় পেলে আফিস পালিয়ে চলে আসে।

ত্বপুরবেলা তার ঘরে সুজাতা মল্লিককে পাওয়া যায়। কোন অসুবিধা হয় না।

দরজায় নক করলেই সুজাতা খুলে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খোলে না। বেশ কিছু সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তারপর সুজাতা খুললে দেখা যায়, সে শায়া বুকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চকিতা বিস্মিত হয় কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। শুধু তাকিয়ে দেখে মেসবাড়ীর জানলার দিকে। সুজাতা বলে, আপনি এসেছেন কি যে খুশি হয়েছি। একা একা থাকতে এতো বোর লাগে। দাঁড়ান

আগে কাপড়টা পরে নি। সে তরিৎগতিতে কাপড়টা পরে নেয়। তারপর দ্রুত বাথরুমে চলে যায়।

চকিতা গেলে প্রতিদিন এমনি ঘটনা লক্ষ্য করে। তার কৌতুহল মেয়েটা যে নগ্ন হযে থাকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আর কি জন্যে এই ব্যবহার চিন্তা করে তার ভীষণ ভীষণ ঘৃণায় উদ্বেগ হয়। একদিন তাই যে চুপি চুপি এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়। সে আগেই লক্ষ্য করেছিল দরজায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে। সেই ফুটো দিয়ে সে চোখ গলিয়ে দেয়। যা ভেবেছিল তাই। মেয়েটির শরীরে কোন সুতো নেই। সে নগ্ন হয়ে কাকে যেন তার বিভিন্ন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছে। কখনও বুক চিতিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট ভরাট স্তন উঁচু হয়ে উঠছে। কখনও ঘুরে গিয়ে নিতম্ব, কখনও দুই উরু মুড়ে সম্মুখ ভাগ। কখনও টান টান হয়ে খাটে শুয়ে পড়ছে।

চকিতা দেখতে দেখতে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠল। ঈশ্বরের এই নারী সৃষ্টি যে সব সৌন্দর্যের উপরে। একে ঢাকা দিয়ে রাখলেই কমনীয়তা প্রকাশ পায়। পুরুষ এই সৌন্দর্য স্পর্শ করবার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু নারী এত নিলজ্জ হয়ে সেই সৌন্দর্য এমনিভাবে মেলে দেবে?

চকিতা খুবই ক্ষুব্ধ হল। হয়ে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। তবু বিলম্ব হল দরজা খুলতে। সুজাতা শায়া বুকে তুলে দরজা খুলে দিল, কি এতো জোর জোর শব্দ করছেন কেন? আমি তো জানি আপনি আসবেন।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি কোন সাড়া নেই। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? চকিতা মিথ্যাটা আউড়িয়ে ঘরের এ পাশ ওপাশ তাকাতে লাগল। ও পাশের জানলাটা তাড়াতাড়িতে পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। চকিতা সেদিকে এগিয়ে গেল। ফাঁক পাল্লার ওপাশে চোখ যেতে একজন স্বাস্থ্যবান চল্লিশোত্তীর্ণ লোককে লক্ষ্য পড়ল। সে চকিতাকে চোখ টিপল। দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

চকিতা খুবই ক্ষুব্ধ হল। এ পাশে সুজাতা তখন বিবর্ণ হয়ে তাকিয়ে

আছে। তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই লোকটি ! সুজাতা কিছু বলতে পারল না, দৃষ্টি নত করল।

আবারও চকিতা তাকাল জানলা দিয়ে। লোকটি আবার চোখ টিপল। সে রেগে গিয়ে পা থেকে জুতো খুলতে যেতেই সুজাতা এসে হাত ধরে ফেলল, কণ্ঠে অনুনয়, চকিতাদি আপনি এ কাজ করবেন না, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মানে ? চকিতা ক্রুর দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকাল। তুমি ঐ জঘন্য লোকটাকে নিজের নগ্ন শরীর দেখাও। লজ্জা করে না।

সুজাতার দৃষ্টি নত হয়ে গেল। তারপর দিশেহারার মত বলল, আমার এ ছাড়া কোন উপায় নেই চকিতাদি। তবু ঐ লোকটা যা চায়, তাই দিই বলে বাঁচবার রসদ পাই। সুজাতা কাঁদতে লাগল।

ওর কান্না দেখে চকিতার বিস্ময় জাগল। জানলা বন্ধ করে সুজাতার হাত ধরে এনে ওর খাটে বসল।

সুজাতা চোখের জলে সব ঘটনা বলে গেল। চকিতাদি, আমি এ হতে চাই নি। একটা চাকরী পেয়ে এই হোষ্টেলে থাকব বলে এসে ছিলাম। সামান্য পড়াশুনা জানা মেয়ে। যেখানে চাকরী করতাম, একটা প্রাইভেট ফার্ম। মালিক একদিন সাফ সাফ প্রস্তাব দিল, আমার মনোরঞ্জন না করলে চাকরী টিকবে না। মনোরঞ্জন বলতে তখন সবটা বুঝিনি। তিনি হাত ধরতেন, কাছে টানতেন, আদর করতেন, জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খেতেন খারাপ লাগত না। ভাবতাম এই বুঝি মনোরঞ্জন। চাকরীর বাজার তো ভাল নয়। এটুকু দিলে যদি বাঁচার পথ বজায় থাকে ক্ষতি কি ? তাছাড়া কুমারী মেয়ে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স, ভালও লাগত এই আদর।

এসবে তো মেয়েদের কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি কিসে হয়, তখন জানতাম। হঠাৎ একদিন সেই মালিক সেই চরম প্রস্তাব করলেন। চাকরী ছেড়ে দিলাম যে জন্যে, আজ আর তাও রক্ষা করতে পারলাম না। সুজাতা কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল চকিতার কোলে। আবার কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসে বলতে লাগল, এই ঘরে ছিল তখন দুটি মেয়ে

হাসি আর অনুরাধা। তারা আদৌ ওয়াকিং গার্ল ছিল না। তারা বড় বড় ব্যবসাদারের অধীনে কলগার্লের চাকরী করত। কেউ কেউ হোটেলে চার পাঁচ দিন কাটিয়ে আসত। ওদের অনেক টাকা। দামী দামী গাড়ী আসত তাদের নিয়ে যেতে। আর তারা খুব লম্বা চওড়া কথা বলত।

একদিন মিসেস গোঙানি এসে ওদের সিট ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিতে সব জানতে পারি। ওরাও দ্বিরুক্তি না করে ছেড়ে দিল। কিন্তু ওরা আরও কত জঘন্য মেয়ে ছিল, পরে জানলাম। পাশের ঐ মেস বাড়ীর কিছু লোককে তারাও খদ্দের করেছিল।

ওরা চলে গেছে মেমবাড়ীর লোকগুলো জানত না। জানলাম এক দিন নিরুপায় অবস্থার মধ্যে। তখন দু'মাস সিটরেণ্ট বাকী পড়ে গেছে। আর কোন কথা না বলে সুজাতা চকিতার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

চকিতা আর কোন কথা বললো না, শুধু সুজাতাকে কাঁদতে দিল। ওর শুধু একটা কথাই মনে আসতে লাগল। পুরুষ আর নারীর মধ্যে তফাৎ কতখানি। ছেলেরা বেকার অবস্থায় পথে পথে ঘোরে। নয়ত চোর, পকেটমার, ছিনতাইবাজ হয়। সে জায়গায় মেয়েরা বেকার হলে অতি সহজে শরীরকে মূলধন করে। যেহেতু খদ্দেরের অভাব হয় না।

সুজাতার এক সময়ে কান্না থেমে যায়। উঠে বসে বলে, চকিতাদি চা খাবে তো!

না।

তোমার আমাকে খুব ঘৃণা হচ্ছে?

হচ্ছে।

এই স্পষ্ট কথায় সুজাতা তার দিকে তাকিয়ে রইল। তুমি হলে কি করতে?

সুইসাইড করতাম।

চকিতা আর দাঁড়াল না। গট গট করে ঘর ছাড়িয়ে চলে এল। নিচে মিসেস গোঙানির অফিস ঘরের সামনে দিয়ে বেরতে হয়। তিনি

দেখলেই ডাকবেন। এই যে মিস চ্যাটার্জি। শুনুন শুনুন। একটু গল্প করে যান।

মিসেস গোঙানি জেনেছেন, চকিতার মনের কথা। ও বিয়ে করবে না, কোন পুরুষের অধীন হবে না। শুনে সুপার খুব খুশি। প্রথম দিন শুনেই তো বাহবা দিয়ে উঠেছিলেন, অ্যাই এপ্রিসিয়েট মিস চ্যাটার্জি। আমরা যদি কিছু মেয়ে এমনি প্রমিশ করি বাছাধন পুরুষরা কোথায় যায় দেখি। কথায় কথায় তাঁর বিবাহিত জীবনের কাহিনীও বলেছিলেন। মিষ্টার গোঙানি একজন নাম্বার ওয়ান ড্রাঙ্কার ও ডিবচ। ড্রিঙ্ক করে এসে স্ত্রীকে পেটাত। বহু বছর ঘর করেও মেলাতে পারেননি। তারপর ছেড়ে এসে ডির্ভোস নেন। কিন্তু মিসেস গোঙানি যে এখন এই হোস্টেলের মালিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে রাত কাটান সে কথা বলেন নি। সেই শোনার পর চকিতা পারতপক্ষে মিসেস গোঙানিকে এড়িয়ে চলে। আজও ডাকতে সে না দাঁড়িয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

৬

এক একজন মানুষ আছে, যারা শান্ত, স্বল্পভাষী, ভীরু, কোন কিছু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করে না। তারা মোটামুটি এই ভেবে ভাল থাকে নিজের ভাগ্যে যা আছে হয়েছে। আর ভাগ্যটাকেই বেশি মেনে নেয়। তারা সাধারণ ঈশ্বরমুখী হয়। চকিতার মা মানসীও তেমনি মানুষ। ত্রিশ বছর ধরে একজনের দাপট মেনে নিয়েও কখনও প্রতিবাদ করেন নি। এবং খুশি তিনি এই ভেবে, স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে আছেন।

আগে ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকতেন। ইদানীং নিজের ঘরের একান্তে রাধাগোবিন্দ মূর্তি স্থাপনা করেছেন। ছেলে মেয়ে স্বামী বেরিয়ে গেলে তিনি স্নান করে এসে আসনে বসেন। ফুল দিয়ে গোবিন্দকে সাজিয়ে ধূপ জ্বেলে দিয়ে এক মনে তার ধ্যান করেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়ায়।

কার উদ্দেশ্যে কাঁদেন বোঝা যায় না। তবে কি তাঁর মধ্যে খুব কষ্ট? বাড়ীর সকলেই জানে মানসী ঠাকুর ভক্ত। জীবনলাল এই নিয়ে কিছু বলেন না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন। দর্শনের চুলচেরা হিসাবে তাঁকে নাস্তিক করেছে। তাঁর কাছে মানুষই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। একদিন কি একটা তর্কে মানসীকে আঘাত করে বলেছিলেন, তোমার ঠাকুর কি তোমাকে বাঁচাবে? বাঁচাতে গেলে আমাকেই বাঁচাতে হবে।

প্রতিবাদ কোন ব্যাপারে মানসী করেন না, এ ব্যাপারেও করেন নি। শুধু তার ফর্সা মুখের ওপর যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল।

একবার কি একটা উপলক্ষ্যে কিছু ফলমূল মিষ্টি দিয়ে মানসী ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছিলেন। পূজা অন্তে প্রসাদ দুই ছেলেমেয়েকে দিতে গিয়েছিলেন। শ্যামল বলেছিল, কি মা এটা।

মানসী বলেছিলেন, বিষ, খেয়ে নে।

শ্যামল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বাড়াতে সাহস করে নি।

মায়ের পরণে লাল পাড় তসর। সীমন্তে চওড়া করে সিঁদূর। কি যে সুন্দর দেখতে হয়েছিল।

চকিতাকে দিতে গেলে সে মাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল। মা তার সুন্দরী। ফর্সা টকটকে রঙের ছোটখাটো মানুষটি। লাল তসর পরে যেন লক্ষ্মী প্রতিমা হয়েছেন। চকিতা যেন সেই লক্ষ্মীপ্রতিমাকেই দেখেছিল।

মেয়ের কাণ্ড দেখে মা দু পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কি করিস চকিতা। ছুঁয়ে দিলে শুদ্ধ কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে না!

চকিতা মাকে ভালবাসে। সত্যিকারের ভালবাসে। বাবার নির্মমতার জন্যে আরও ভালবাসে। তার আজকের এই যে পুরুষ বিদ্বেষ সে ঐ মায়ের জন্যে। কিন্তু মাকে দেখে তার অবাক লাগে, মার শরীরে কি রক্তমাংস বলে কিছু নেই? এত সহ্য করার ক্ষমতা মা পেল কোথায়?

মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সে মায়ের রাধাগোবিন্দকে দেখে। ঐ পটের মধ্যে কি শক্তি আছে যে শক্তির কৃপায় মা সর্বংসহা!

সেদিন প্রথম মাইনে পেয়ে মার জন্যে একখানি লাল পাড় গরদের কাপড় কিনল। প্রথম উপার্জিত টাকা। কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছা করল। কাকে দেয়, প্রথম মার কথাই মনে এল। দুঃখী মা তার। যা কিছু মেয়েকে বলতে আসেন স্বামীর হুকুমে। না হলে তিনি কোন প্রতিবাদই করেন না। সেই মাকেই চকিতা মনে মনে ভালবাসে। তাই তাঁর জন্যে সবার আগে কিনল। আর কিনল পূজো করার কাপড়। যেটাতে মাকে সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্র লাগে। আর একজনের জন্যে কিনল একটি সুদৃশ্য সিগারেটকেস ও লাইটার। তাহলে চকিতারও ভালবাসার লোক আছে। সিগারেটের কেস, লাইটার যখন তখন সে পুরুষ। তবে চকিতা এত বড়াই করে কেন? সে কোন পুরুষকে সহ্য করতে পারে না। তার কথা তবে পরেই বলা যাবে।

চকিতা যখন বাড়ী ফিরল, মা তখন সন্ধ্যেবেলা পূজোর ঘরে। ঘণ্টা বাজছে যখন তখন মা আরতি করছে। বাবা যে আসেনি নিশ্চিত, কারণ বাবা এলে মা এত শব্দ করে পূজো করত না।

চকিতা কাপড়ের প্যাকেট বগলে মার ঘরের সামনে দাঁড়াল। তার ঘরের পাশেই মার এই ছোট্ট ঘর। আগে মা তার ঘরে শুত। সে বড় হতে মা এ ঘর ছেড়ে পাশের ভাঁড়ার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

মা বাবা এক সঙ্গে কোনদিন শুয়েছেন কিনা চকিতা জানে না। জ্ঞান হবার পরই দেখছে মা বাপ আলাদা শোন। মা একটু বেশি রাত্রে বাবার ঘর থেকে চলে আসেন। আজও সেই নিয়ম বজায় আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে যে ব্যতিক্রম না হয় তা নয়। মার হয়ত শরীর খারাপ বা ইচ্ছে নেই নিজের ঘরেশুয়ে আছেন। তখনই বাবার বিরক্তি মাখা ডাকাডাকি লেগে যায়। চাপা গর্জন হলেও সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। আর কারও ভাঙে কিনা জানে না কিন্তু তার ভেঙে যায়। তখনই পুরুষ জাতটার ওপর তার বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

চকিতা কি রে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি ?

ভাবনায় ছেদ পড়ল চকিতার। মা পুজো সেরে সামনে দাঁড়িয়ে।

মা দেখো তোমার জন্যে কি এনেছি ?

চকিতা মার হাতে আলগোছে প্যাকেটটা ফেলে দিল। পুজোর কাপড় না ছুঁতে একদিনই বলে দিয়েছিলেন মানসী।

প্যাকেটটা না খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মানসী মেয়ের দিকে তাকালেন। কিরে এতে ? দৃষ্টিতে বিস্ময়।

খোলো না, তারপর বলছি। চকিতা আহ্লাদী স্বরে বললো।

চোখে বিস্ময় নিয়ে মানসী প্যাকেট খুলে ফেললেন। কাপড়টা দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কি রে এ কার জন্যে ?

আমার জন্যে। আমি এবার তোমার পাশে বসে পুজো করব।

বেশ তো ভালই। মেয়েদের তো এই হওয়াই উচিৎ। মানসী মুখ ফেরালেন।

কাপড়টা কেমন হয়েছে বললে না তো !

দামী কাপড় সুন্দর।

এটা তোমার জন্যে এনেছি।

আমার জন্যে আবার আনতে গেলি কেন ? আমার তো এটা রয়েছে। নিজের কাপড়ে হাত দিলেন।

বাহ আমার বুঝি আনতে ইচ্ছে করে না। চকিতা আদো আদো কণ্ঠে বললো। তাছাড়া আজ আমি প্রথম মাইনে পেয়েছি।

মানসী কাপড়টা হাতে নিয়েই মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওর বাপ যতটা খারাপ বলে মেয়ে যে ততটা খারাপ নয় সে কথা ভাবতে লাগলেন। চকিতা ফিরছে মানসী ডাকলেন, চকিতা !

কি মা!

তুই কি সত্যিই বিয়ে থা করবি না ?

এ কথা যে কেন বার বার বলো। চকিতা বিরক্ত।

যে লোকটা প্রায়ই তোকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে যায়, সে কে ?

ও তো আমার বস্।

তোর বাবা এ সব পছন্দ করেন না।

বাবা তো অনেক কিছুই পছন্দ করে না। বাবার পছন্দ নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আমরা বড় হয়েছি, আমাদের কোন মতামত নেই? বাবাকে বলে দিও মা, যদি তার একেবারে অপছন্দ হয়, আমি বাড়ী ছেড়ে দেব।

যেটুকু প্রসন্ন মন ছিল, মায়ের ঐ কথায় তিক্ত হয়ে গেল। সে বেগে নিজের ঘরে ঢুকে এল। বাইরের ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়। কিন্তু ঘরের এই তিক্ততা ভাল লাগে না। আজই তো অফিস থেকে বেরোচ্ছে পাড়ার ধনী সন্তান সিদ্ধার্থ গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই হাড়-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল কিন্তু ভদ্রতা!

আরে কি খবর হঠাৎ?

তোমার খোঁজেই এখানে চলে এলাম। সিদ্ধার্থ গাড়ীতে বসে কথা বলছিল। চকিতা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। উঠে এস না। সিদ্ধার্থ দরজা খুলে দিল।

কিন্তু আমার যে একটা কাজ আছে।

বেশত আমি সেখানে পৌঁছে দিচ্ছি। যেতে যেতে কথা হবে।

কি কথা চকিতার অজানা নয়। সেই ভালবাসার প্যানপানানি। অনেক ছোটবেলা থেকে এই ছেলেটি তার পিছনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে তাকে আমোল দেয়, আবার কোন সময় দু কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু তবু ছেলেটি পথ ছাড়ে না।

আজ আবার এসেছে একেবারে অফিস পর্যন্ত। সিনক্রিয়েট করতে চায় না বলে চকিতা ওর গাড়ীতে উঠে বসল। পিছনে বসছিল, সিদ্ধার্থ হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে এল।

চকিতা সিদ্ধার্থর সাহস দেখে বিস্মিত হল। একেবারে হাত ধরে ফেলল। একটুও ইতস্তত করল না।

সিদ্ধার্থ গাড়ী চালাতে চালাতে চকিতার দিকে তাকাল। দূরে বসে আছো কেন, কাছে সরে এসো না।

চকিতা ওর দিকে তাকাল, বলে কি ছেলেটা? সাহস তো কম নয়।

চকিতা কাছে এল না দেখে সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বলল, নীলম বাজপেয়ীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসো, আর আমার পাশে বসতে বুঝি সঙ্কোচ!

চকিতা অপ্রতিভ হল কিন্তু জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে। নীলম বাজপেয়ী আমার বস কিন্তু তুমি কে?

সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বলল, ধরে নাও না আমার একটা সম্বন্ধ।

কি ধরব? চকিতা বড় বড় চোখ মেলে সিদ্ধার্থকে বিদ্ধ করল।

তোমার প্রেমিক, তোমার লাভার কিম্বা তোমার ফিঁয়াসে।

ঐ তিনটে শব্দর তো একই মানে।

মানে যাইহোক আমি তো তাই।

মোটেই না। আমার প্রেমিক হতে তুমি যাবে কেন?

সিদ্ধার্থ একটু নিস্প্রভ হল। কিন্তু পরক্ষণে সামলে নিল, বাহ এতকাল তো তাই জানতাম।

কী জানতে?

আমি তোমার প্রেমিক।

চকিতা মাথা নেড়ে বলল, কথাটা ঠিক নয়। তুমি হাজার বার আমাকে প্রেমিকা ভাবতে পার। আমি কোনদিনও তোমাকে প্রেমিক ভাবি নি।

তাহলে কাকে ভাবো? সিদ্ধার্থর একটু অবাক চাউনি।

এবার চকিতা খিল খিল করে হেসে উঠল, একজন যুবতী সুন্দরী মেয়েকে কখনও এ কথা জিজ্ঞাসা কর না।

মানে?

মানে যা বললাম ভেবে দেখো বুঝতে পারবে।

সিদ্ধার্থ একটু ক্রুদ্ধ হল, তোমার দেখছি খুব পাখনা গজিয়েছে।

এটা আজ নতুন জানলে?

নতুন।

আগে দেখ নি?

দেখেছি তবে এতটা নয়। এখন চাকরী করছ। স্বাধীন জেনানা

হয়েছ। বিয়ে করবে না শুনলাম। সুতরাং সম্পূর্ণ তো বেওয়ারিশ।

হঠাৎ সিদ্ধার্থ চকিতার একটা হাত চেপে ধরল। আমি অনেক দিন ধরে লাইন দিয়ে আছি। আমি ভাগ পড়ব কেন প্লিজ।

গাড়ী তখন দ্রুত চলছিল না। চকিতা হাতটা ছাড়িয়ে নিল। অপমানে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, সিদ্ধার্থ গাড়ী থামাও।

সিদ্ধার্থ তখন লালসায় হাসছে, না থামালে কি করবে? ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি?

তোমার এতো সাহস আমায় বেওয়ারিশ বলো।

আমি কেন সবাই তো বলছে। আর তুমিই তো সবাইকে বলেছ, বিয়ে না করে স্বাধীনভাবে থাকবে। তার মানেটা কি?

তার মানেটা কি বলো?

তার মানে তো তোমার এক পুরুষে মন উঠবে না।

চকিতা অবাক হয়ে গেল সিদ্ধার্থর কথা শুনে। তোমরা এমনি মানে করেছ?

কেন ভুল মানে?

চকিতা এত স্মার্ট মেয়ে, জবাবও তার মুখে জোগালো না।

অনেক পরে বলল, অদ্ভুত তোমরা। নিজেরা আমার সম্বন্ধে বেশ সাজিয়ে নিয়েছ। সিদ্ধার্থ গাড়ী থামাও আমি নেমে যাব।

সিদ্ধার্থ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল। কেন তোমার সম্বন্ধে কি ভুল ভাবা হয়েছে?

প্লিজ সিদ্ধার্থ, গাড়ী থামাও। চকিতা বেশ চেঁচিয়ে কথাটা বলল। কিন্তু গাড়ী না থামাতে চকিতা দরজা খুলে ফেলল। এই দেখে সিদ্ধার্থ গাড়ী থামাল।

চকিতা নামতে নামতে বলল, আর কখনও আমার সঙ্গে মিট করবে না।

সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বলল, দেখি!

বাঁথরুমে গিয়ে খুব ভাল করে স্নান করল চকিতা। একটা মেয়ে ভাল হয়ে বাঁচতে চাইলে কেউ বিশ্বাস করে না। যে সিদ্ধার্থ কখনও মুখ

তুলে কথা বলত না। সব সময় সমীহ করত, সেও সাহস পেয়েছে। কিন্তু কেন কেন? পুরুষ এই সাহস পায় কেমন করে? একজন মেয়ে পুরুষের খাঁচায় ঢুকতে চায় না বলে সহস্র পুরুষ এসে তাকে খোবলাতে চাইবে? বেওয়ারিশ! কথাটার মানে কি? দাদা, পরমেশ্বর, সিদ্ধার্থ এরা বেওয়ারিশ জেনে তাচ্ছিল্য করছে। খুব দিশেহারা মনে হল নিজেকে।

এই সময় ঘরে ঢুকল সরমা, ওদের পরিচারিকা, দিদিমণি খাবে না?

এই মেয়েলোকটি তাদের বাড়ীতে পাঁচ বছর কাজ করছে। বাড়ীর লোকের মত হয়ে গেছে। বছর চব্বিশ, পঁচিশ বয়স। কালো দোহারা শক্ত চেহারা। খাটতে পারে খুব। মুখখানি হাসি হাসি। শোনা যায় বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর ঘর করতে গিয়ে দেখে স্বামী আর এক মেয়েলোকের বশ। পালিয়ে এসেচে। সেই থেকে এ বাড়ীতে আছে।

কোনদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা চকিতা জিজ্ঞাসা করে নি। আজ নিজের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা জাগল। ও ওতো একটা মেয়ে। ও একজন পুরুষের অধীনে যেতে গিয়ে অপমানিত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। তবে শোনা যায় ওর চরিত্র ভাল না। মাঝে মাঝে এক একদিন ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়, তারপর ফিরে আসে ঝোড়ো কাক হয়ে। মা গজ গজ করে। শুনি তোর তিনকুলে কেউ নেই। কোথায় যাস্ প্রায় প্রায়।

সরমা?

কি দিদিমণি?

তোমার যে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর কথা এখন আর মনে পড়ে না?

না দিদিমণি। কদিন আর তাকে দেখেছি। পরিচয় হতি হতি তো পেলিয়ে এলুম।

তবু তো তোমার স্বামী। পুরুত ডেকে বিয়ে হয়েছিল তো!

সে হলি কি হবে দিদিমণি? ভাতার যদি ভাত না দেয়, বৌ বলে সোহাগ না দেয়, তবে সে স্বামীতে কি দাম?

তবু মায়া তো হয়?

সরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কক্ষনো না। মায়া কিসের? সে মরদ কি মায়া দেখাল?

মেয়েটার যে স্বামীর কথায় প্রচুর ক্ষোভ আছে, সেটা দেখা গেল। পুরুষের অবহেলা যে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা সহ্য করতে পারে না, সেটা সরমাকে দেখেও বোঝা যায়। ও নিজের ভাত নিজে উপায় করে খায়। কারও পরোয়া করে না। সম্পূর্ণ ঝাড়া হাত পা হয়ে আছে। কিন্তু মা বলে, প্রায় প্রায় কোথায় যেন যায়' মনে পড়তে চকিতা সরমার দিকে তাকাল।

সরমা প্রায় তুমি কোথায় যাও? বলো আত্মীয়র কাছে। সে তোমার কি রকম আত্মীয়?

এতক্ষণ সরমা তেজে চড়বড় করছিল, হঠাৎ এই কথায় মিইয়ে গিয়ে লাজুক চোখে মাথা নামাল।

চকিতা অবাক হল ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল, ও, আত্মীয় মানে মনের মানুষ? তা লজ্জা পাবার কি আছে?

সরমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে চকিতার পা ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলল, দিদিমণি তুমি যেন মাকে বলো না।

চকিতা রগড় করবার জন্যে চোখে হেসে বলল, তা নয় বলব না। কিন্তু যার কাছে যাস্ সে কি তোকে বিয়ে করবে?

ম্লান কণ্ঠে সরমা বলল, ওর যে বৌ আছে দিদিমণি?

তাহলে তোর কি হবে?

সেই তো চিন্তা। তারপর পরক্ষণে চোখ বড় বড় করে বলল, তবে ও খুব ভালবাসে।

তুই যে ছুটি নিয়ে ওর কাছে যাস্ থাকিস্ এক সঙ্গে?

আবার লজ্জা পেয়ে রাঙা হল সরমা। হি দিদিমণি। ওর তো বৌ এখানে থাকে না দেশে থাকে। কোথায় যেন পিওনের কাজ করে। এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। নিজে রান্না করে খায়।

আর তুই গিয়ে কদিন সেখান থেকে তার রান্নাবান্না করে দিস্। বৌ হয়ে থাকিস।

হি দিদিমণি, মানুষটার বড় কষ্ট। একদম নিজে রান্না করতে পারে না।

তাতো হল, এরপর যদি পেটে একটা আসে কি করবি ?

সেই তো চিন্তা দিদিমণি। সব বুঝি ভাবি আর যাব না কিন্তু কেমন কষ্ট হয় ? মরদের সঙ্গে তো কোনদিন ঘর করি নি। কেমন ভাল ভাল কথা বলে সব কেমন ঘুলিয়ে দেয়।

সরমা আবেগে মরদের আরও সুনাম করতে যাচ্ছিল। চকিতা থামিয়ে দিল, থাম্ থাম্ খুব হয়েছে।

সরমা যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, দিদিমণি মাকে যেন বলো নি, চাকরী গেলে মুস্কিলে পড়ে যাব।

চকিতা আর কথা বললো না। সরমা চলে গেলে ভাবতে লাগল, নারীর জীবনে পুরুষের একটা আকাঙ্খা থেকেই যায়। সেই জন্যে নারীরা জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সরমার মতো মেয়েরা পারে না। যৌবনের তাড়নায় তৃপ্তির জন্যে সেই বিপজ্জনক বিবরেই নিজেকে প্রবেশ করায় ?

কিন্তু শিক্ষিত মেয়েরা ? তারাও কি একই আকাঙ্খার মরীচিকার পিছনে ছুটে মরে ? চকিতাকেও কি তাই মরতে হবে ? খেয়ে দেয়ে এসেও অনেকক্ষণ ধরে সেই সব কথাই ভাবতে লাগল চকিতা।

৭

ছুটি ছিল বলে চকিতা নিজের ঘরে শুয়ে একটা ক্রাইম খিলার এক মনে পড়ছিল। বেরবে সে বারটায়। তাই অনেক সময়। ট্রানজিসটার বাজছিল। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত।

হঠাৎ দরজায় একটা ছায়া পড়ল। সামনে এসে দাঁড়াল অর্চনার মেজ বোন টুকুমা। ওরা তিন বোনই দেখতে ভাল। টুকুমা একটু স্বাস্থ্যবতী। মুখখানি ফর্সা গোল। খুব একটা সাজগোজ করে না

কিন্তু না করলেও তাকে দেখতে ভাল লাগে। চোখ দুটি বসা, নাক একটু খাড়া কিন্তু ঠোঁট পুরু। সেই পুরু ঠোটে হালকা ন্যাচারাল কালারের লিপষ্টিক। ঐ লিপষ্টিক ছাড়া কোন প্রসাধন নেই। আর কাপড়ও পরে হালকা রঙের। তাকে আরও ভাল দেখায়। স্বর নীচু কিন্তু কথা বেশ ভারী ও তীক্ষ্ণ। হেসে হেসে বিঁধিয়ে কথা বলতে পারে। চকিতা বইয়ের মধ্যে এমনি বিভোর যে দরজার সামনে টুকুমাকে দেখতে পেল না।

এমন কি টুকুমা ঘরে ঢুকে চকিতার খাটের কাছে দাঁড়াল তবু তার লক্ষ্য পড়ল না। অগত্যা সাড়া দিতে হল, চকিতাদি কি এতো পড়ছ যে ঘরে চোর ঢুকলেও সাড়া নেই।

চকিতা বই থেকে চোখ সরাল। বালিশে ঠেসান দিয়ে আড় হয়ে শুয়েছিল, হেসে উঠে বসে বলল, আয় কি ব্যাপার তুই ?

কেন আসতে নেই বুঝি ?

না না আসবি না কেন ? তুই তো খুব একটা আসিস্ না।

আসব আর কোথায় বলো ? তুমি তো কোথায় আছ জানিই না। দিদি বললে তুমি হোস্টেলে আছো। সেখানে শুনলাম, মাসে মাসে সিটরেণ্ট জমা দিচ্ছ, এখনও দখল নাও নি।

সে কি তুই সেখানে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলিস্ ?

বারে দিদি তো বললো। চাকরী পেয়ে স্বাধীন জেনামা হয়েছ। দাও না চকিতাদি আমাকে একটা এমনি চাকরী। তুই চাকরী করবি কেন ? অর্চনার পর তো তোর বিয়ে হবে।

দূর বিয়ে করব না হাতী। কি বিশ্রী এই সিষ্টেম। জানো চকিতাদি, দিদির এই বিয়ের সম্বন্ধ দেখে আমার বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

কেন রে ? চকিতা হেসে টুকুর দিকে তাকাল।

সেই যে লোকটা সুদীপ্তবাবু বাবার অফিসার, কি যে হ্যাংলা কি বলবো ?

চকিতা হাসিভরা মুখে তাকিয়ে রইল।

তুমি হাসছ চকিতাদি! পুরুষ যদি এমনি হ্যাংলা হয়, কোন মেয়ে তাদের পছন্দ করে বলো! আবার লোকটা আগে একটা বিয়ে করে-ছিল। মানে একবার টেষ্ট করা আছে। সেই টেষ্ট করা লোকের হ্যাংলামো দেখে দিদিও রেগে কাঁই।

আমরা যেন এক একটি রসগোল্লা। গিলে নিতে পারলেই যেন আনন্দ। আবার বলে কিনা! আমি বিয়ে করছি একজনকে। ফাউ পাচ্ছি দুজন।

মূচ্ছা তো রেগে গিয়ে বলে, অতো শস্তা নয় মশাই, আমাদের দাম আছে। আমরা ফাউ হতে চাই না।

লোকটাও হেসে বলে, শালীর আবার দাম কি? সমাজে শালীর স্থান এই বলে নিজের কোল বাজায়। মাগো কি কোল। এই ভারী ভারী উরু, মোটা মোটা হাত পা। চুলেও কিছু পাক ধরেছে।

চকিতা হেসে বলল, ওসব ইয়ার্কি, রাগ করার কি আছে? তা লোকটা কি বিয়ের আগেই শ্বশুর বাড়ীতে আসতে শুরু করেছে?

তাই তো দেখছি। একদিন দুদিন অন্তর বাবাকে নিয়ে নিজের গাড়ী করে আসবে। আর ঘণ্টা দুই করে কাটিয়ে যাবে।

না চকিতাদি, অ্যাই প্রমিশ, আমি বিয়ে করব না। তোমাকে আগে কত হেট করেছি, তুমি পুরুষ বিদ্বেষী বলে। এখন দেখছি সত্যিই এদের সহ্য করা যায় না। একদিন ঘরে কেউ নেই, আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর তার একটা হাত কোথায় জানো, আমার একটা বুকে।

তুই এ কথা অর্চনাকে বলেছিস্?

না দিদিকে বললে তো সে বিয়েতে বসবে না! তবে এ তোমায় আমি বলে দিলাম চকিতাদি। দিদি সুখী হবে না। ঐ লোক যখন এত হ্যাংলা ওর এক স্ত্রীলোকে হবে না।

স্ত্রীলোক কথাটা শুনে চকিতা বেশ জোরে জোরে হেসে উঠল। হাসি প্রশমিত হলে বলল, না টুকু সব পুরুষই এমনি। ওরা বাড়তি কিছু পেলে ছেড়ে দেয় না।

কিন্তু তুমি এমনি বলছ, আমাদের তো দু একজন বন্ধু আছে, কই

তারা তো এমনি নয়?

সব ছেলেরাই এমনি। তবে বয়স ও অভিজ্ঞতার ফ্যারাকে হয়ত তারতম্য হয়। কেউ সঙ্কোচে এগোতে পারে না কিন্তু ভেতরে খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আমাদের মেয়েদেরও তো খিদে আছে। কই আমরা তো হ্যাংলামো করি না।

চকিতা এই আলোচনা থামাবার জন্যে বলল, নে এখন ওসব কথা রাখ্‌ কি খাবি বল্‌?

কিছু না। ভাল কথা বলে সে নিজের ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করল।

তুমি আসছ তো।

তারিখটা দেখে চকিতা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল।—আরে সময় তো বেশি নেই মাত্র সাতদিন।

এই সময়ও ঐ লোকটা দিচ্ছিল না। শুধু বিয়ের মাস নয় বলে চেপে গেল।

টুকুমা উঠতে উঠতে বলল, আমার কথাটার কিন্তু জবাব দিলে না।

কোন কথাটার রে?

বাহ বললাম না একটা চাকরী যোগাড় করে দাও।

চাকরী কেন করবি? অর্চনার পর তো তোর বিয়ে দেবেন বাবা মা।

বললাম না বিয়ে করব না। আমি তোমার মত স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাতে চাই।

চকিতার মনে পড়ল, অর্চনাদের বাড়ীতে তাকে পছন্দ করে না, তার এই পুরুষ বিদ্বেষের জন্যে। ওদের মা বাবা তো বটেই, অর্চনার পরের দুই বোনও। এই টুকুমাও কম তর্ক করেনি। সেই এখন বলছে স্বাধীনভাবে চলবে। চকিতা হেসে বলল, চাকরী তো হাতে নেই। চেষ্টা করতে হবে। তবে তুই আর একটু ভাব। টক করে ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

আমি কিন্তু অনেক ভেবেই ডিসিশন নিতে চলেছি।

আচ্ছা আচ্ছা অর্চনার বিয়ে হয়ে যাক্ না কথা হবে।

তুমি আমাকে হেল্প করবে বলো।

চকিতা মাথা হেলিয়ে একটু হাসল।

টুকুমা চলে গেল।

চকিতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, বারটা বাজতে মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী। ও একটুও দেরী না করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। অন্যান্য কাজ গুলি সারতে সারতে বার বার টুকুমার কথাগুলি মনে আসতে হাসি পেতে লাগল।···মাগো লোকটা কি হ্যাংলা? তর সয় না এক-দিনও। ভাবী শ্বশুড় বাড়ীতে রোজ রোজ আসা কি ভাল?

মেয়েরা যেমন একজনের স্তুতি চায়। আবার হ্যাংলাদের ঘৃণাও করে। কিন্তু মেয়েদের রূপ যৌবন দিয়েছেন ভগবান। সৌন্দর্য মানুষের কাম্য। সেই সৌন্দর্যের প্রতি সবারই আকাঙ্খা আছে। সেইজন্যে পুরুষরা একটু হ্যাংলার মতো মেয়েদের দেখে। সে দেখাটা এত প্রকট যে মেয়েরা সহ্য করতে পারে না। শুধু দেখা না, লালসার চোখ দিয়ে কাছে টানবার চেষ্টা। মেয়েরা এই লালসাকেই ঘৃণা করে। অথচ তারা একবারও ভাবে না, তাদের কদর না থাকলে তাদের জীবন বৃথা। সৃস্টির এই চক্র অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে।

তবু বৈচিত্র্যময় জগত, পরিবর্তন আছেই। মেয়েরা যত শিক্ষিত হয়ে চলেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাচ্ছে। তারা চায় না স্তুতি। চায় না হ্যাংলামো। যে পুরুষ হ্যাংলার মত দখল চায় তাদের তারা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। সেই ধরণের পুরুষ তারা চায়। যারা কখনও হ্যাংলা হবে না। অথচ এ যেন এই জগতে পাওয়া দুর্লভ।

একজন পুরুষ এখানে পরিচিত হচ্ছে দেখুন তার প্রকৃতি। অনির্বাণ একজন অঙ্কন শিল্পী, বয়স ত্রিশ, স্বাস্থ্যবান' গৌরবর্ণ চেহারা, এক মুখ দাড়ি। খদ্দরের ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবী পরে। ওলটানো চুল, অবিন্যস্ত, বহুদিন স্নান না করলে যেমন চুলের অবস্থা হয় তেমনি। লম্বা লম্বা ঘাড় পর্যন্ত চুল। আঁচড়ায় কম, কিন্তু জটিল অঙ্কনে ব্যস্ত থাকলে

মাঝে মাঝে হাত দিয়ে চুলের গোছা পিছনে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। দিন-রাত ছবি আঁকায় ব্যস্ত। দুখানি ঘর তার ষ্টুডিও ও থাকার জায়গা। একজন শুধু ভৃত্য দিয়ে সে জীবন কাটিয়ে চলে। কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই, খাওয়া দাওয়ারও বালাই নেই। যখন খুব পেটটা টনটন করে তখন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে, রাম কিছু খাবার টাবার আছে?

রাম মানে রামপূজন, রামপিয়ারী যে কোন একটা নাম তার ছিল। একদিন পথ থেকে এর স্বাস্থ্যের জন্যে ধরে এনেছিল অনির্বাণ। তখন তার দশ বছর বয়স। সেই দশ বছর ছেলের দেহাতী শরীরটা দেখে অনির্বাণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ধরে এনে ছবি আঁকে অনেকগুলি। কালো কষ্টি পাথরের একটিদেব-শিশু। নিটোল তার হাত পা, বড় বড় চোখ, একমাথা কোঁকড়ানো চুল।

অনির্বাণ মানুষের ছবি আঁকতে ভালবাসে। নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। শুধু বৈশিষ্ট্য থাকলেই হল। রামের ছবি আঁকতে আঁকতে তার প্রতি মায়া জন্মেছিল, তারপর যখন শুনেছিল তাকে দেখবার কেউ নেই, সেই থেকে রাম থেকে গেছে।

আজ দশ বছরের পিছনের কাহিনী সে সব। রাম আজ বিশ বছরের সুঠাম যুবক। সে না থাকলে আজ অনির্বাণ কানা। রামই সংসার দেখে অনির্বাণের। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কিছু। অনির্বাণকে খাওয়ার কথা বলা যায় না। বললে বিরক্ত হয়, কিম্বা কাজে তন্ময়, কথা কানে নেয় না। তাই রাম প্রত্যহ রান্না করে অপেক্ষা করে, যদি বাবু খেতে চায়। কতদিন কত রান্না অভুক্ত অবস্থায় ফেলে দিতে হয়েছে।

মানুষটা শুধু শিল্পী নয়, ভীষণ ভাবুক ভোলা। কি যে কখন ভাবে বোঝা যায় না। সব সময় চোখ দুটি ভাবে বিভোর। তবে ছবি যখন আঁকা সম্পূর্ণ হয়, তখন দেখার মত। যার ছবি আঁকা হল, তার চেয়ে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে যায়। সে নিজেই ভাবে আমি কি সত্যি এমনি! মাঝে মাঝে ষ্টুডিও ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে যায়। শোনা যায় ছবির রসদ আনতে চললো।

তারপর নিয়ে এল কোন নারী বা পুরুষ। কারো চেহারার বৈচিত্র্য

দেখলেই অনির্বাণ তাকে চেপে ধরবে ছবি করার জন্যে।

কাউকে কাউকে টাকা দিয়ে বশ করে। কাউকে, কথা দিয়ে। বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি। একখানি নয় অনেক গুলি। কোনটা জামা কাপড় পরা, কোনটা সম্পুর্ণ নগ্ন। মেয়েরা নগ্ন হতে চায় না। সে বোঝায় তাদের। আপনার এ শরীর ঈশ্বরের দান। আপনি কি চান না তা ছবি হয়ে থাকুক। কেউ মুখ দিতে চায় না, অনির্বাণ তাদের হুবহু প্রতিছবি আঁকে না।

নারী শরীরের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। শুধু ছবির ভাল পোর্ট্রেট হলে তার মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়।

কোন ভাবাবেগ নেই। নিখুঁত একজন শিল্পী। নারী পুরুষকে নগ্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তুলি চালিয়ে যায়। নারী শরীরের প্রতিটি গোপন অংশ তাঁর তুলিতে সজীব হয়ে ওঠে। কারও গোলাকার নিটোল স্তন, কারো মসৃণ ঢেউ খেলানো নাভি ও তলপেট। কারো ভারী উরু, দুই উরুর মধ্যবর্তী মিলন স্থান গুরু নিতম্ব। পুরুষেরও তাই। বিশাল বুক, পেশী বহুল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এমন কি পুরুষাঙ্গও সজীব করে আঁকে।

একটি মেয়ের শুধু মুখের ছবি দশ বারো খানা। তার চোখের চকিত চাউনি, ঠোঁট টিপে টিপে হাসি, দাঁত ঝিকিয়ে হাসি। কথা বলার ভঙ্গি এইসব নিয়ে দশখানি ছবি।

কারও দেহের ছবিও এমনি অনেকগুলি। বসা, ঘোরা, চলা, পাশ ফেরা শোয়া।

বহু ছবি তার বিক্রী হয়ে যায়। অনেকেই স্টুডিওতে এসে পছন্দ করে নিয়ে যায়। বিদেশেও বহু ছবি রপ্তানী হয়। তার ঘরের সর্বত্র ছবি টাঙানো। কেউ এসে দেখতে শুরু করলে তার অনেক সময় লেগে যায়।

আবার অনেক ছবি অবহেলায় এক জায়গায় গোছা করা পড়ে থাকে।

একদিন যে ছবি কত দরদে আঁকা হয়েছিল, তার অবস্থা দেখে

অবাক লাগে। প্রথম প্রথম রাম ঘর গোছাতে গিয়েছি অনির্বাণ, তাকে গোছাতে দেয় নি। বলেছে, যে যেখানে আছে থাক্, হাত দিস্ না।

আমি শুধু গুছিয়ে রাখছি, কোথাও সরাব না।

অনির্বাণ বিরক্ত, বলছি যা তাই করবি। এ ঘরে যে যেখানে থাকে সেইখানে থাকবে। তুই ঐ গলিতে থাকবি।

সেই থেকে দু ঘরের পরে একটা সরু জায়গা, তারপর অবশ্য বাথরুম। সেইখানে রাম থাকে। সেইখানে রান্নার সরঞ্জাম। রামের প্রয়োজন এক এক সময়ে খুব অপরিহার্য হয়ে ওঠে যখন কোন ঝামেলা আসে।

ঝামেলা হয় মেয়েদের নিয়ে। তারা নগ্ন হয়ে ছবি দিতে চায় না। বলে, ও মাগো একজন বাইরের মানুষের কাছে ল্যাংটা হব কি? আমার বুঝি লজ্জা করে না। তাকে বোঝাতে হয় নানান ভাবে। কিন্তু কোন কোন মেয়ে ভীষণ চালাক, তারা শিল্পীর চোখ দেখে ধরে কোন লোভ নেই। কেউ আবার ছবি টবি আঁকিয়ে কাপড় পরতে চায় না, বলে আমার পাওনাটা দিয়ে দাও। অনির্বাণ টাকা দিতে যায়। সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, ওসব কে চাইছে? মজাটা দাও। ঝামেলা অনেক রকম, অনির্বাণ তো প্রায় রাস্তা থেকে মানুষ ধরে। একবার একজন বেশ্যার ফিগার দেখে তার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল। সে কোমর দুলিয়ে চোখ নাচিয়ে টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর তিনদিন ধরে সিটিং দিয়ে চারখানি ছবি আঁকার পর তাকে বিদায় দিতে চাইলে সে যেতে চাইল না। বলল, বারে তিনদিন থাকলুম, কাজ হয়ে গেল বলে তাড়িয়ে দেবে সেটি হবে না।

তা কি করতে হবে?

অনির্বাণের সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি বাপু পুরুষ নও। না আমার যৌবন নেই। আমায় সুখ না দিলে আমি নড়ছিই না।

অনির্বাণ এসব ঝামেলা ভোগ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে

তাই মাথা গরম করল না। তাকে অনেক করে বুঝিয়ে আরও কিছু টাকা বাড়তি দিয়ে তারপর বিদায় করল।

এ সব ঝামেলায় আজকাল রামও হাত লাগায়। যাদের ছবি আঁকা হয়। তারা রাত্রিবেলা থাকে, খায়। সেই খাওয়ার ব্যবস্থা যেমন করে, তেমনি বেহারাগিরি করলে রাম বেশ দাপট দেখায়।

বেশ্যাটি যখন অনির্বাণকে নাস্তানাবুদ করছিল, রাম এগিয়ে এল, কি ঠাক্‌রোন টাকা তো পেয়েছ এবার কেটে পড়ো না? রাম বাঙ্গলাও ভাল শিখে নিয়েছে।

মেয়েলোকটি চোখ মুখ ঘুরিয়ে ঝাঁপটা দিয়ে বলে, তুই কেরে, আমি তোর মনিবের সঙ্গে কথা চালাচ্ছি।

আমি মনিবের দেখ ভাল করি, ওসব চালাকি ছাড়ো।

ছাড়াচ্ছি, বেরো বেরো বলছি।

মারতেই যায় প্রায়। অনির্বাণ থামিয়ে দিল। সে খুবই মৃদুভাষী লোক, হাত জোড় করে বিনয়ে বলল, মা ওর কথা শুনে রাগ করবেন না। আমায় রেহাই দিন।

মা বলতে মেয়েলোকটা একটু সমজে গেল। গজ গজ করতে করতে বিদায় নিল, মা বলতে এয়েছে মা!

অনির্বাণ পথে পথে ঘোরে ভাল ফিগারের জন্যে। ছবি হবে এমন ফিগার দেখলেই তার কাছে গিয়ে আবেদন জানায়। কেউ কেউ লুব্ধ হয়ে এগিয়ে আসে। আমার ছবি আঁকবেন, কি মজা।

এমনি চকিতাও একদিন পথে দাঁড়িয়েছিল বাসের আশায়। অনির্বাণ এসে পাশে দাঁড়াল। পাশে ঠিক নয়, তিন চার ফুট দূরত্বে। ও এই দূরত্ব থেকেই মানুষটিকে লক্ষ্য করে। তখন থেকেই তার মনে মনে ছবি আঁকা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অনির্বাণ তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টে। স্বভাবত কেউ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে পাগল মনে হয় বা অন্য কিছু। আর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো সেই অন্য রকমটা আরও স্পষ্ট হয়। অনির্বাণ তাকিয়ে থাকতে চকিতার রাগ হয়। সে খুব স্মার্ট ও স্পষ্ট বক্তা। দ্রুত কাছে এগিয়ে এসে রাগ দেখিয়ে বলল,

আপনি এমনি অভদ্রর মতো গিলে খাচ্ছেন কেন ?

অনির্বাণ অভ্যস্ত এই সব কথা শোনায়। মৃদু হেসে বলল, গিলে খাচ্ছিলাম না, শিল্পীর চোখ দিয়ে ফিগার দেখছিলাম ?

আপনি শিল্পী ?

অনির্বাণ মাথা নাড়ল।

কিসের শিল্পী ? গানের না অভিনয়ের !

আমি একজন অঙ্কনশিল্পী।

চকিতা আগ্রহ হল। তারপর একটু একটু করে সব কথা জেনে নিল। ওর খুব অবাকও লাগল যখন শুনল তার ছবি অনির্বাণ আঁকতে চায়। শিল্পীর তুলিতে অমর হয়ে যাবে, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই চাইবে।

সেই দিনই অনির্বাণের সঙ্গে চলে এল চকিতা ষ্টুডিওতে। ঘুরে ঘুরে সব ছবি দেখল। কত মানুষের ছবি। কত তার ভাব ভঙ্গি। বিভিন্ন মেয়েদের নগ্ন ছবি দেখে চকিতা অনির্বাণের দিকে তাকাল। এ সব ছবিও এঁকেছেন ?

অপরাধ কি ? এ তো মেয়েদের লুব্ধ অঙ্গ, সৌন্দর্যও কম না।

কিন্তু শালীন তো নয়।

তখন পিকাসো ছ্য ভিঞ্চির ছবির উপমা আনল অনির্বাণ। নারী সৌন্দর্যের মধ্যে এত জোরালো আর্ট লুকিয়ে আছে যে এ এড়ানো যায় না। ঈশ্বরই তো আসল শিল্পী। তিনি পুরুষ প্রকৃতি দুই সৃষ্টি করেছেন কিন্তু প্রকৃতি সৃষ্টির সময়ে যেন আলাদা চিন্তা করেছেন।

চকিতা তার মনের চোখ দিয়ে অনির্বাণকে লক্ষ্য করতে লাগল। এ আর্টিষ্টটি সত্যিই আর্টিষ্ট না তার ভেতরে গোপন বাসনা কাজ করে কিন্তু কথা বলতে বলতে অবাক লাগল এর অন্য দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

প্রথমদিনই চকিতার একটা স্কেচ শুরু করল। কিছুটা কাঠামো দেখে ষ্টুডিওতে ছবি তোলার মত চকিতা উল্লসিত হয়ে উঠল। তখন তার কলেজের ফাইন্যাল ইয়ার। কথা থাকল প্রতিদিন দু ঘণ্টা সে সিটিং দেবে।

দু ঘণ্টা সিটিং দিতে দিতে তিন চারখানি ছবি হয়ে গেল। সবই জামা কাপড় পরা। আর কি আশ্চর্য, এমনি পুরুষ চকিতা জীবনে দেখেনি! তার এই সদ্য যৌবন প্রাপ্ত জীবনে শুধু লুব্ধ চোখেই দেখেছে। আর সে চোখ পুরুষের। পুরুষের চোখ মেয়েদের কাছে কি চায় তার ঐ জীবনে জানতে বাকী থাকে নি। সে জায়গায় এই আর্টিষ্ট যেন কেমন? শুধুই শিল্পীর চোখ। সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে শুধু শিল্পীর চোখে দেখে। আর তুলি দিয়ে শুধু আঁকে। কোন ভাবাবেগ নেই। ভাবলেশহীন চোখ। এমন মানুষ চকিতা জীবনে দেখে নি। দিনের পর দিন আরও যেতে যেতে তার অদম্য কৌতূহল হতে লাগল।

এ যে একজন সৃষ্টি ছাড়া মানুষ। এমন মানুষও জগতে আছে! তখন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছিল পুরুষ সম্বন্ধে দারুণ ঘৃণা। সেই ঘৃণা যেন এই শিল্পী ম্লান করে দিল। এল শ্রদ্ধা। আরও পরীক্ষার জন্যে সে শরীরে কিছু লুব্ধ অংশ খুলে খুলে দেখাতে লাগল যাতে তার ধারণা মিথ্যে হয় কিন্তু কেউ দেখে না তার পর্যাপ্ত নারী ঐশ্বর্য। মনে মনে রাগও জমে।

তারপর যখন একদিন কুণ্ঠিত হয়ে অনির্বাণ জানাল, মিস চ্যাটার্জি বুক থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিতে কি সঙ্কোচ বোধ করবেন?

চকিতা জানে তার বক্ষ সৌন্দর্য অনন্য। নারী পুরুষ উভয়েই তার দিকে তাকালে তাদের চোখ কোথায় গিয়ে বিস্ময়ে আটকে যায়। অনির্বাণের কথা শুনে ভাবল আবার একটা পরীক্ষা, দেখি আর্টিস্ট কোথায় গিয়ে পেঁছোয়। হেসে বলল, শুধু কাপড় সরাব, না জামাটাও খুলে ফেলব?

অনির্বাণের উত্তর: এখন ওসব না, জামার ওপর থেকে একটা শুধু স্কেচ। ছোট একটা টিপয়ের ওপর বসে চকিতা অবহেলায় আঁচলটা ফেলে দিল। আর আর্টিস্ট গভীর অভিব্যক্তি দিয়ে তুলি টেনে চলল।

তারপর এক এক করে চকিতা তার সমস্ত অঙ্গ মুক্ত করে দিল। যে নারী রত্ন বিশেষ একজনের জন্যেই ঢাকা দেওয়া থাকে। যা উন্মোচন করতে কোন কুমারী মেয়ে চায় না, সেই আবরণ ইচ্ছে করে একটি একটি

করে চকিতা খসিয়ে দিতে লাগল। তখনও বিস্ময়ে তার লক্ষ্য ছিল অনির্বাণের সেই পুরুষ লোভের দৃষ্টি। কিন্তু হা হতোস্মি কোন লোভই কি নেই ?

আগে কখনও এ সব কথা প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করে নি। অনেকদিন লক্ষ্য করার পর যখন কোনই লোভ দেখল না, তখন একরকম আক্ষেপেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি গো শিল্পী ? তোমার কি ভেতরে আসক্তি বলে কিছু নেই।

অনির্বাণ হাসে, কি জানি ?

চকিতা দাপটে বলে, কি জানি মানে কি ? তুমি কি মানুষ নও ?

আমি শুধুই আর্টিস্ট ! আর্টের চোখে আমার সব কিছু দেখা।

কিন্তু শুনেছি আসক্তি না থাকলে শিল্পী হতে পারে না।

কি জানি আমার এসব মনে হয় না।

আসক্তি জাগে না ?

সৌন্দর্যে দেখলে শুধু তাকে তুলে এনে ছবিতে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে।

এ রকম মানুষ চকিতা জীবনে দেখে নি। পুরুষের হ্যাংলা চোখ এত দেখা আছে যে এই পুরুষ যেন তার সমস্ত শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে লাগল। বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসা করে। বন্ধুরা বলে, তুই বাপু আরব্য উপন্যাসের গল্প শোনাতে আসিস নি। আমাদের দেখে না কে রে ? মেয়েরা দেখে হিংসার চোখে। ছেলেরা দেখে ভোগের চোখে। আমরা তো এক একজন হীরা জহরতের সমান।

কলেজের এক চালবাজ বন্ধুকে একদিন নিয়ে এল চকিতা। খুব কথা বলে। আর খুব চাল দেয়। সে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে লাগল আর হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে লাগল। প্রচুর মেয়ের নগ্ন শরীর। নানান ধরণের। কুমকুমের অবস্থা দেখে চকিতা মজা পেতে লাগল। যে এত কথা বলে। সে হঠাৎ ফিসফিস স্বরে কথা বলতে লাগল। তারপর একজন বলিষ্ঠ পুরুষের সামনে এসে তার উত্থিত পুরুষাঙ্গ দেখে লজ্জায় চোখে হাতচাপা দিল।

অনির্বাণ তখন একমনে একটা ছবি আঁকছিল। চকিতা গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল। ওর ধারণা ছিল অনির্বাণ কুমকুমকে দেখে ছবির জন্যে প্রস্তাব করবে কিন্তু আলাপ করবার মুহূর্তে একবার চোখ তুলে তাকাল তারপর নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

চকিতা বুঝল, শিল্পীর চোখে কুমকুম ফেল।

অথচ কুমকুম দেখতে খারাপ নয়, মুখখানি একটু লম্বা, কপাল চওড়া কিন্তু দুটি চোখ, নাক ও ঠোঁট জোড়া অপূর্ব। ছবি হবে না কেন? তাছাড়া ফিগারও খারাপ নয়। শরীরে একটা নাচেরও ছন্দ আছে। কুমকুম বিদায় নিলে চকিতা সেই কথা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার বন্ধুর ছবি আঁকলে না কেন?

উনি বুঝি ছবি আঁকাতে এসেছিলেন তা আমাকে বললে না কেন?

উনি আঁকাতে আসবেন কেন? ওকে তো তুমি প্রস্তাব দেবে। আমায় যেমন দিয়েছিলে।

ও।

ও বলে চুপ করে গেলে কেন? উত্তর দেবে তো!

অনেক পরে অনির্বাণ বলল, কি জানো চকিতা? তুমি যে কথাগুলি বললে আমি ভাবলাম। ছবি যে কখন কাকে নিয়ে মন চায় আমি নিজেই জানি না। তোমার বন্ধুকে নিয়ে একটা ছবি আঁকলে হত, না! উনি খুব রাগ করলেন, না! আর একদিন আসতে বলো না। আমি ছবি এঁকে দেব?

শিল্পীর মন কখন কি চায় সেই জানে না। সেই শিল্পীকে শ্রদ্ধার বেদীতে আজ দু বছর ধরে বসিয়ে রেখেছে চকিতা। যখনই পুরুষ সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে অসম্ভব ঘৃণার উদ্বেগ হয়, চকিতা স্বর্গে চলে আসে। সেই স্বর্গের সংসারে সে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়।

আর রাম দিদিমণিকে দেখে সব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আর মনিবের যত দোষ সে এক এক করে দিদিমণিকে বলে যায়।

চকিতা কোনদিন বাড়ীতে রান্না করে নি। বাড়ীর রান্না করে মা ও সরমা, এখানে এসে সে স্টোভ নিয়ে বসে। নিজের ব্যাগ থেকে

টাকা বের করে বাজার করায়। তারপর গিন্নীর মত রান্না করে অনির্বাণের হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে বলে, মশাই ওঠো তো। গুড ম্যানের মত স্নান করে এসো। আর কি আশ্চর্য, অনির্বাণ কোন কথা না বলে সুবোধ বালকের মত স্নান করতে যায়।

রাম দেখে বলে, দিদিমণি তুমি এলে দাদাবাবু খুব জব্দ হয়। আর আমি রোজ রান্না করি, আর ফেলি। ফেলি-আর রান্না করি, দাদাবাবুকে আর খাওয়াতে পারি না।

চকিতা লক্ষ্য করে মানুষটা কোথায় যেন একটা স্থিতি চায়। কারুর যেন একটা অবলম্বন আশা করে। একদিন বলল, তুমি একটা বিয়ে করে নাও।

ত্যুস, ওসব আমার জন্যে নয়।

কেন নয়, তুমি তো টাকা পয়সা খারাপ উপায় কর না।

চকিতা অন্য কথা বলো প্লিজ।

চকিতা থেমে যায়। সে থেমে গিয়ে ভেতরে ভেতরে সমস্ত শ্রদ্ধা এই মানুষকে দিয়ে রেখেছে।

এবারেই অনেকদিন আসা হয় নি। প্রথম মাইনে পেয়ে মার জন্যে কিনেছিল গরদের লালপাড় শাড়ী, মাকে সে ভালবাসে। আর সিগারেট কেস ও লাইটার কিনেছিল এই অনির্বাণের জন্যে। এই সিগারেট খাওয়া শেখায় চকিতাই নিজে। একদিন কি কথায় কথায় বলেছিল, শিল্পী তো কত নেশা করে, তুমি কোন নেশা কর না কেন?

অনির্বাণ কোন জবাব দিতে পারে নি।

তারপরই চকিতা এক প্যাকেট সিগারেট ও দেশলাই এনেছিল। অনির্বাণ আজ চেন'স স্মোকার হয়ে গেছে চকিতারই জন্যে। চকিতার ভাল লাগে এইভেবে, এই ভাবুক ভোলা শিল্পীর সে মন জয় করে রেখেছে। আর তারও কারণ যেখানে পুরুষরা হ্যাংলামো করে তাদের তিতিবিরক্ত করে সেখানে এই মানুষটি একেবারে অন্য রকম।

আজ প্রায় তিনমাস চকিতা এই দিকে আসতে পারে নি। তার নিজের কতকগুলি ঝঞ্ঝাটের জন্যে এই বৈষম্য হয়েছে। তারপর যদিও

বা সিগারেট কেস লাইটার কিনে রাখল, অফিসের প্রতিদিন নানান রকম পার্টিতে অ্যাটেণ্ডের জন্যে হয়ে ওঠে না। তারপর তো আছে নীলম বাজপেয়ীর নানা আবদার। সুন্দরী যুবতী মেয়েকে পেলে কি সহজে ছাড়তে ইচ্ছে করে?

পার্টিতে যেতে যেতে আর এক উটকো জুটেছে; সূর্যাস্ত বিশ্বাস। নামটা দেখেই চকিতা চমকিত হয়েছিল। আলাপ হতে আরও চমকালো। লোকটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। নীলমের মতোই স্মার্ট ও বুদ্ধিমান চেহারা। তবে নীলম ধীরে ধীরে কথা বলে, এ কথার তুবড়ি ছোটায়, আর হা হা করে হাসে। হাসতে হাসতে পাশে যে থাকে তার পিঠ, হাত, উরুর ওপর অযথা থাপ্পড় মেরে নিজের খুশি জাহির করে।

মেয়ে হলেও সে রেহাই পায় না। নীলম শুধু চকিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল, আমার পি, এ মিস চকিতা চ্যাটার্জি।

সূর্যাস্তর পাশে বসেছিল চকিতা, হঠাৎ সে চকিতার উরুর ওপর দারুণ থাপ্পড় মেরে বলল, বলবে তো বাজপেয়ী, আমি অনেকক্ষণ ধরে ওয়াচ করছিলাম, হা হা হা।

সেই সূর্যাস্ত বিশ্বাস এখন নীলম বাজপেয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছে। চকিতা মনে মনে হাসে নীলমের কাণ্ড দেখে। বিভিন্ন পার্টিতে যেতেই হয়, আর সূর্যাস্ত চকিতাকে দেখেই এগিয়ে আসে। অবশ্য চকিতা ওকে দেখে একটু তফাতে দাঁড়িয়েই অভিবাদন জানায়। দুদিন দু রকম থাপ্পড় তার খাওয়া আছে। পিঠ ও উরুর ব্যথা এখনও মেলায় নি।

পার্টিতে প্রায় সময় সূর্যাস্ত চকিতার পাশে। একদিন তো এমন নাস্তানাবুদ শুরু করল, চকিতাকে ড্রিঙ্ক করাবে। বাঁচাল নীলম, না বিশ্বাস ও পছন্দ করে না, কি দরকার ঝামেলা করার।

চকিতা লক্ষ্য করছে, নীলম যেন দিন দিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে সূর্যাস্তর ব্যাপারে। একদিন তো ফেরার সময়ে বলেই ফেলল, বিশ্বাস ইজ নট সো জেণ্টলম্যান, বি কেয়ার ফুল।

তার আগেই সূর্যাস্ত অন্যত্র হাত বাড়িয়েছে চুপিসাড়ে। মিস

চ্যাটার্জি বাজপেয়ী তোমাকে কত টাকা মাইনে দেয়! আমার অফিসে চলে এসো।

চকিতা জেনেছে এই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর পাগল লোকটার কোম্পানী নীলমের চেয়ে অনেক গুণে বড়। ওর অফিসে জয়েন করলে মন্দ হয় না। আর আত্মরক্ষা, নীলমের কাছে ও যা সূর্যাস্তর কাছেও তাই। নীলম ধীরে ধীরে সরে এসে মিষ্টি কথা বলে হাত ধরে, সূর্যাস্ত সে জায়গায় থাপ্পড় মেরে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেয়। ওর ওখানে কাজ নিলে চকিতাকে একটু ব্যায়াম করে নিতে হবে। পেটে খেলে অবশ্য পিঠে সইবে। এমনি যখন মানসিক ভারসাম্য। হঠাৎ একদিন একটা পার্টির মধ্যেই অনির্বাণ তাকে অসম্ভব টানতে লাগল। সিগারেট কেস ও লাইটার বহু দিন ধরে তার ব্যাগে রাখা আছে। যেতে পারছে না কিছুতে সময় হচ্ছে না। পার্টিতো প্রায়ই আছে। তাছাড়া প্রত্যহ বস নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে না। যে কোন অজুহাত দেখিয়ে আটকে দেন।

আজ পার্টিতেই একটা অভিনয়ের প্রসঙ্গ আনতে হল। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে সোফার ওপর ঢলে পড়ল।

সূর্যাস্ত এগিয়ে এল, কি হয়েছে মিস চ্যাটার্জি!

ভীষণ মাথা ধরেছে।

আমি ভীষণ ম্যাসেজ করতে পারি। বলে সে চকিতার মাথার কাছে বসতে গেল। চকিতা তাড়াতাড়ি উঠে বসে মাথাটা চেপে ধরল, না না প্লিজ মি, বিশ্বাস। আমায় একটু একা থাকতে দিন, একা থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি দারুণ ম্যাসেজ করতে পারি। এখুনি রিলিভ হয়ে যাবে। বাঁচাল নীলম। মিস চ্যাটার্জি আপনি বরং বাড়ী চলে যান।

সেই ভাল একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি এলেও সূর্যাস্ত হাত বাড়িয়ে হেলপ করতে চাইল। আমার হাতটা ধরুন মিস চ্যাটার্জি, না হলে পড়ে যেতে পারেন।

নো থ্যাঙ্কস বলে চকিতা ম্লান হেসে মাথা ধরার অভিনয় করতে করতে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে হোটেল ছাড়লে সে

সুস্থ মানুষের মত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল কোথায় যেতে হবে

৮

অনির্বাণ আজ তিন চারদিন হল একজন বিশাল মানুষের পোর্ট্রেট এঁকে চলেছে। সামনে দণ্ডায়মান সেই মানুষ। সাঁওতাল পরগণা না কোত্থেকে একে ধরে এনেছে অনির্বাণ। লোকটা যেমন কালো, তেমন তার স্বাস্থ্য। বিশাল বুক, বিশাল হাত, পা, চওড়া কাঁধ, এক মাথা হাউ হাউ চুল। মুখখানিও বেশ লম্বা, মোষের শিঙের মতো ঘোরানো নাক, বড় বড় চোখ। তার কোমরে একফালি একটা ন্যাংড়া পরিয়ে অনির্বাণ তাকে তুলিতে ধরে চলেছে।

লোকটির ভাষা বোঝা যায় না। কি যে আউ আউ করে বলে। খায় হাতীর মতো। খাওয়ার কোন বাদ বিচার নেই পরিমাণ বেশি হলেই হল। পরিমাণ বেশি না হলে আউ আউ করে কি সব রেগে বলে।

হাতের থাবা এত চওড়া যে সেই হাতে ভাত ধরে একথালা। সেই এক থালা তুলে সে একবার খায়। সাধারণত এই সব ফিগারদের জন্যে খাবার আসে হোটেল থেকে। অনির্বাণ বাড়ীতে ঝামেলা করতে মানা করে। প্রথম দিন এই বিশাল দৈত্যের জন্যে খাবার এসেছিল হোটেল থেকে। পরিমাণটা একটা মানুষের মত ছিল।

সেই খাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে খেয়ে বিশাল আউ আউ করে রেগে উঠল। তাকে কোনরকমে শান্ত করে অনির্বাণ রামকে নির্দেশ দিল বাড়ীতে রান্না করার।

সে এই চারদিন ধরে দুবেলা শুধু বিশাল হাঁড়ীতে ডাল ভাত রান্না করে চলেছে। ছোট্ট কেরোসিন ষ্টোভে বিশাল হাঁড়ীতে ভাত ফুটতে রীতিমত সময় লাগে। চাল আর ভাত হতে চায় না কিন্তু তার জন্যে ঐ বিশাল দৈত্যের কিছু এসে যায় না। সে তার পরিমাণ মতো পেলেই

কয়েক গরসে তা সাবাড় করে দেয়। এমন খাওয়া দেখেও অনির্বাণের মাথায় একটা ছবি এসেছে। ছবির নাম সে দেবে, 'মানব দৈত্যের দৈত্য সমান আহার।' স্কেচও করে ফেলেছে, হাত দিয়ে দৈত্য যখন ভাত তুলছে দু চোখে ক্ষুধার্ত উল্লাস।

রামের যত কষ্টই হোক, মনিব ছবি আঁকলেই সে তৃপ্ত। দৈত্যের আহার ছবি দেখে সে মনিবের দিকে প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

এ সব ছবি যখন লোকে দেখবে অবাক হয়ে যাবে। মানুষটা তো তখন আর এখানে থাকবে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দৈত্যর কোমরে একটা কানি সম্বল করে অনির্বাণ তন্ময় হয়ে তুলি চালিয়ে চলেছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য দৈত্য বাগড়া দিচ্ছিল বসে পড়ছিল। আউ আউ করে কি সব বলছিল। অনির্বাণ আবার বুঝিয়ে তাকে দাঁড় করাছিল।

ওদিকে রাম স্টোভে হাঁড়ী বসিয়ে জল ফোটা পরখ করছে, এই সময় চকিতা হুড়মুড় করে ঢুকল। ঢুকেই দৈত্য ও অনির্বাণকে দেখে থমকে গেল।

অনির্বাণও দেখেছিল কিন্তু সে তুলি না থামিয়ে সেই অবস্থায় বলল, কি পথ ভুলে নাকি?

চকিতা এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে বলল, ও কথার উত্তর পরে দিচ্ছি। এ সব কি করছ? একে পেলে কোথায়? বলেই চকিতার চোখ আটকে গেল, বিশাল দৈত্যের কানি সর্বস্ব নিম্নাঙ্গে বৃহৎ পুরুষাঙ্গ ঘোড়ার মতো লম্ববান। ও লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়ে অনির্বাণের দিকে তাকাল। অনির্বাণ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদু হাসল, কেন ফিগারটা ভাল নয়?

কিন্তু জোটালে কেমন করে?

আমি জোটাই কেমন করে জানো না? তা আমার প্রথম প্রশ্নটার কিন্তু উত্তর পাই নি।

কি প্রশ্ন?

পথ ভুলে কোত্থেকে এলে?

আমি আসি তুমি কি চাও ?

অনির্বাণ মৃদু হাসল, চাই কিনা জানি না। তবে এখন দেখে মনে হচ্ছে তুমি এলে ভাল লাগে।

বেশ বলে চকিতা এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তারপর বলল, শুনে কৃতার্থ হলাম যে আর্টিস্ট মশাই আমার আগমণ প্রত্যাশা করেন।

অনির্বাণ এই কৌতুকে সাড়া দিল না, বলল, সত্যি তুমি এতদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে !

সে সব কথা বলতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আপাতত শোনো আমি চাকরী করছি।

অনির্বাণ বিস্ময়ে বলল, হঠাৎ। শুনেছি তোমার বাড়ীর অবস্থা খারাপ নয়।

মশাই বাড়ীর অবস্থার জন্যে চাকরী করছি না, নিজের জন্যে।

কেন নিজের কি দরকার ? অনির্বাণ বোকার মত প্রশ্ন করল।

বাহ নিজেকে চালাতে হবে না ?

অনির্বাণ অনেকক্ষণ আর কোন কথা বললো না। ওর সাংসারিক বুদ্ধি এতই স্বল্প যে এর বেশি সে এগোতে পারে না। চকিতাও সেটা বুঝল, হেসে বলল, বাপ মা আমার বিয়ে দিতে চায়। আমি বিয়ে করব না। সেইজন্যে চাকরী নিয়ে বাড়ী ছাড়তে চাই।

অনির্বাণ এবার হুম করে একটা কথা বলল, না না বিয়ে করনি ঠিক করেছ ! ফিগারটা নষ্ট হয়ে যেত।

আমার বাবা মা তোমার কথা শুনলে তোমাকে গুলি করে মারত। চকিতা হেসে উঠল।

গুলি করে মারতেন কেন ?

সে তুমি বুঝবে না। নাও তোমার কাজ কর। বলে চকিতা রামের দিকে তাকাল।

রাম এতক্ষণ দিদিমণির সঙ্গে কথা বলার জন্যে ছটফট করছিল, এবার সুযোগ পেতে এগিয়ে এল, দিদিমণি তুমি এতদিন পর এলে ?

এই নির্বান্ধব পুরীতে রামের সঙ্গী কেউ নেই। মনিব বিভোর হয়ে

ছবি আঁকেন। তিনি ছবি নিয়ে সময় কাটান। যা কথা হয় প্রয়োজনীয়। রামের উপস্থিতি অনির্বাণের মনেই থাকে না। মাঝে এই দিদিমণি আসত, তেমনি এই ষ্টুডিওতে প্রাণের সাড়া পড়ত। তাই রাম অভিমানী হয়ে ঐ প্রশ্ন করল।

চকিতা রামের কাঁধে হাত দিয়ে সস্নেহে বলল, সত্যিই খুব দেরী করে ফেলেছি নারে রাম।

দেরী বলে দেরী। পাঁচ ছ মাইনা তো হবেই।

ওরা কথা বলতে বলতে ভেতর দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ চকিতার লক্ষ্য গেল, ছোট স্টোভের ওপর বিরাট হাঁড়ী দেখে।

ও কিরে রাম, ঐ বিশাল হাঁড়ীতে কি হচ্ছে?

আর বলো না দিদিমণি, ঐ রাক্ষসটা এসেছে, দুবেলা চার কেজি ভাত রান্না করে দিতে হয়।

চা-র-কে-জি! চকিতা অবাক হয়ে দূরে সেই বিশালের দিকে তাকাল।

অনির্বাণ তখন বিশালকে ধমকাচ্ছিল, বার বার বলছি, ওদিকে তাকিও না, ছবি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিশাল ফিরে ফিরে চকিতাকে দেখছিল।

চকিতা এলে সাধারণত রান্নাটা নিজে করে। আজ সেদিকে গেল না দেখে রাম বলল, দিদিমণি রান্না করবে না?

না রে আজ ভাল লাগছে না? অফিসে খুব খাটুনি গেছে। তার চেয়ে আয় বলে ওর ব্যাগ খুলে পাউরুটি, মাখন, সন্দেশ রামের হাতে দিল।

চারটে ভাগ কর।

চারটে ভাগ কি হবে? ঐ দৈত্যর এই অল্পতে……?

তুই কর তো। তারপর দেখছি।

চকিতা এখানে এলে যেন কেমন প্রাণ পায়। এখানে কোন জটিলতা নেই। সব সহজ সরল। আর সে যেন এখানকার কর্ত্রী হয়ে যায়। এমন মনে হয়, সে মাঝে মাঝে এখান থেকেই কোথাও

যায়, ফিরে এলে সবাই অভিযোগ করে। এই রাম তার ভৃত্য। অনির্বাণ তার কর্তা। এই দুখানি ঘর তার সংসার কিন্তু এসব মনে হলেও যার জন্যে মনে হবে তার কোন উন্মাদনা নেই। সে ফিরেও দেখে না। এমন কেন মনে হয় জানে না, যেখানে পুরুষরা হ্যাংলার মত তার অনুগ্রহ পাবার জন্যে ব্যস্ত সেখানে এই মানুষ সম্পূর্ণ নির্জীব। আবার এও যে ভাবে সে। অনির্বাণের হ্যাংলামো নেই বলেই বুঝি তার এখানে আসতে এত ভাল লাগে।

নিজের সংসারে আসার মত চকিতা ঘুরে ঘুরে ঘরের ছবিগুলি দেখতে লাগল। যে সব নতুন ছবির সংযোজন হয়েছে তাও দেখল। রাম পিছনে থেকে থেকে সে সব বুঝিয়ে দিতে লাগল। মাঝে মাঝে চোখ চলে যেতে লাগল আঁকার জায়গার দিকে। সেখানে সেই দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে, আর অনির্বাণ এক মনে তুলি চালিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে রাম খাদ্য চার ভাগ করে একটা টেবিলে রেখে ডাকল। চকিতা এগিয়ে গিয়ে অনির্বাণের হাত থেকে তুলিটা কেড়ে নিল। তোমার ফিগারকে পোষাক পরিয়ে নিয়ে এস। অনির্বাণ জানে চকিতার ব্যবহার। কোন কথা না বলে শুধু হাসল।

টেবিলের দুদিকে দুজনে বসল। দূরে রাম ও দৈত্য দাঁড়িয়ে রইল। দৈত্য একটা প্যাণ্ট গুটিয়ে পড়েছে। রাম হাতে খাবার দিতে আউ আউ করে কি বললো।

রাম বোঝানোর চেষ্টা করল, এটা রাতের খাবার নয়, জল খাবার।

কি বুঝল কে জানে? ছ পিস পাউরুটি মাখন মুখে এক বারে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। চোখ কিন্তু চকিতার দিকে। চোখ তার প্রথম থেকে চকিতার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সেটা লক্ষ্য করেছে চকিতা।

এমন তাকানোর ভঙ্গি দেখে অনির্বাণকে ইংরিজী করে বলল, তোমার ফিগার আমাকে গিলতে চায় নাকি?

বোধ হয় তোমায় পছন্দ হয়েছে? অনির্বাণ মৃদু হাসল।

যে রকম তাকাচ্ছে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে?

কেন নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না ?

অসম্ভব। ঐ বিশাল ফিগার।

চকিতা হঠাৎ কাণ্ড করল, ইসারায় হাত নেড়ে দৈত্যটাকে ডাকল। তাকে ডাকা হয়েছে দেখে সে হঠাৎ দাঁত বের করে হাসতে লাগল। আর সেই হাসি দেখে চকিতার মনে হল এ হাসি তার চেনা। যে সব পুরুষ নারীদের ভোগের জন্য লালসার চোখে চায়, এ হাসি সে হাসি।

দৈত্যটা হাসতে হাসতে চকিতার একেবারে ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

ঐ দেখে রাম ছুটে গিয়ে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল।

অনির্বাণ কিছু করছিল না, যেন কোন নাটক দেখছে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল।

দৈত্যটা হঠাৎ তার বিশাল ভারী হাত দিয়ে চকিতার মুখখানি চেপে ধরল। তারপর দাঁত বের করে মুখ নামিয়ে অজস্র চুমু খেতে লাগল চকিতার গালে, ঠোঁটে, কপালে সর্বত্র। চকিতা চিৎকার করে দৈত্যর হাত ছাড়াতে গেল।

দৈত্য তখন আউ আউ করে কি বলে চকিতাকে নিজের বাহু বন্ধনে তুলে নিল।

চকিতার কাপড় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সে চিৎকার করে বলল, অনির্বাণ আমাকে বাঁচাও।

অনির্বাণ তখন দেখছে, দেখছেই। তার চোখে যেন কিসের দৃষ্টি। দৈত্য চকিতার কাপড় ছিঁড়ে ফেলল, ব্লাউজ ধরে টানাটানি করতে লাগল। চকিতার দুই উত্তুঙ্গ বুক দৈত্যের দুই থাবার মধ্যে। ধস্তাধস্তি খুবই হচ্ছিল।

হঠাৎ অনির্বাণ লাফিয়ে তার আঁকার জায়গায় চলে গেল। কাগজ স্ট্যাণ্ডে বসিয়ে স্কেচ করতে লাগল।

দৈত্য তখন চকিতাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর উঠে বসেছে।

রাম এতক্ষণ লোহার ডাণ্ডাটা কাজে লাগাতে পারে নি মনিবের

জন্যে। মনিব উঠে যেতে সে দৈত্যর মাথা লক্ষ্য করে পর পর ডাণ্ডা কষিয়ে দিল কবার।

দৈত্য চকিতার বুক থেকে পড়ে গেল হুঁড়মুড় করে। তার মাথা দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল, দেহ নিস্পন্দ।

চকিতা উঠে দাঁড়াল। সে তখন হাঁফাচ্ছে। মুহূর্তে কাপড় ঠিক করে নিয়ে রামকে সে জড়িয়ে ধরল, তুই না থাকলে রাম। কথা তার আটকে গেল।

অনির্বাণ তখন এক মনে স্কেচ করে চলেছে। সেখানে গিয়ে রাগে ফেটে পড়ল চকিতা, তুমি কি? তুমি মানুষ না অন্য কিছু!

অনির্বাণ তখন দৈত্য ও চকিতার যুদ্ধের ছবি তুলিতে ধরেছে। সে দিকে তাকিয়ে রাগে কাগজটা স্ট্যাণ্ড থেকে ছিঁড়ে নিতে গেল চকিতা। তুমি এই জন্যে বাধা দাও নি অনির্বাণ! কিন্তু ঐ দৈত্যটা যদি আমার কিছু করত। রাগে দুঃখে চকিতা চোখের জল সামলাতে পারল না।

অনির্বাণ এক মনে ছবির গায়ে তুলি বুলিয়ে চলেছে।

চকিতা সেই দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, কি চুপ করে আছো কেন? কিছু তো বলবে!

অনির্বাণ তুলি না থামিয়ে বলল, কি শুনতে চাও বলো।

তুমি আমাকে বাঁচালে না কেন?

বাঁচালে কি এই ছবিটা পেতাম? অনির্বাণ হাসতে লাগল।

তাহলে তোমার কাছে ছবিটা বড়, আমি কেউ নয়?

রাগ কর না।

একটু শান্ত হয়ে বসো। মাথা ঠিক হয়ে যাবে। চিৎকার করে রামকে বলল, বিশালের মাথায় একটু আইডিন দিয়ে দে। আজ আর ওকে ডাকিস্ না।

ওর নির্দেশগুলি এক মনে শুনে চকিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ওর এতদিন ধারণা ছিল; এখানে তার একটা অধিকার আছে। এই ঘর গৃহস্থালীর মধ্যে সে একজন আপনজন। এখন দেখছে অনির্বাণ শুধু ছবিই বোঝে। একজন নারীর সম্মান রক্ষায় তার কোন আগ্রহ নেই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত অনেক হয়ে গেছে। এত হয়েছে খেয়াল ছিল না। সে চলে যাবার জন্যে উদ্যত হল।

অনির্বাণের ছবি তখন প্রায় শেষের দিকে। সম্পূর্ণ না হলেও বোঝা যাচ্ছে, একজন বিশালকায় একজন নারীর শীলতাহানি করতে উদ্যত।

চকিতা চলে যাচ্ছে দেখে অনির্বাণ তুলি রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চকিতা তুমি চললে ?

চকিতা কোনই উত্তর দিল না।

চকিতা তুমি রাগ কর না। আমি যদি তখন বাধা দিতাম, তাহলে কি এই ছবি হত ?

তুমি তোমার ছবি নিয়েই থাক। চকিতা দ্রুত চলতে লাগল।

ছুটে গিয়ে অনির্বাণ হাত ধরতে গেল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল, তুমি ছুঁয়ো না আমাকে। এতদিন আমার ধারণা ছিল, অন্তত একজন পুরুষের কাছে আমার কিছু মূল্য আছে। দেখছি সবাই তোমরা এক। চকিতা একরকম রেগেই সেস্থান থেকে বেরিয়ে এল।

একজন কুমারী মেয়ে এত রাত্রি পর্যন্ত বাইরে ঘোরে, আমাদের সমাজ কখনই তা বরদাস্ত করে না, জীবনলালও তা করলেন না। খুবই ক্ষীপ্ত তিনি, মানসীকে দুষতে লাগলেন। তুমি যদি একটু শক্ত হতে তাহলে মেয়েটা এমন বেয়াড়া হত না। মানসী আর কি জবাব দেবেন, শুধু স্বামীর তর্জন গর্জনই শুনতে লাগলেন।

জীবনলালের তর্জন গর্জনের আরও কারণ আগে নীলম বাজপেয়ী এসে চকিতার খোঁজ করেছিলেন। পাটি থেকে মাথা ধরা নিয়ে চলে এসেছে কেমন আছে জানতে চান। চকিতা আদৌ বাড়ীতে আসে নি শুনে একটু বিস্মিত হলেন। শ্যামল বাড়ীতে ছিল না। জীবনলালকেই নীলম বাজপেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে হল। তিনি লোকটাকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সম্পূর্ণ মদ্যপ একজন লোক চকিতার বস্। মেয়ের যে চারিত্রিক শুচিতা একদম গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। এত করেও মেয়েটাকে বশে আনা গেল না।

নীলম বাজপেয়ী অবশ্য প্রফেসর চ্যাটার্জিকে খুব সম্মান জানালেন। একটি শিক্ষিত ফ্যামিলীর মেয়ে বলেই মিস চ্যাটার্জি খুবই মরিয়া। অবশ্য তাঁর সব কথাই বেশ জড়িতস্বরে। মাতাল হন না নীলম বাজপেয়ী কিন্তু জড়ানো কথা ও চোখ লাল দেখে বোঝা যায়।

জীবনলাল অতি কষ্টে সংযম ধারণ করে ভদ্রতা রক্ষা করলেন। কোন কটু বাক্য বললেন না, শুধু বললেন, মেয়েটা আমার কথা শুনলে খুবই প্রীত হতাম কিন্তু সে খুবই বেয়াড়া টাইপের মেয়ে।

নীলম আর কি বলবেন চুপ করে রইলেন।

এর আধঘণ্টা পরে সূর্যাস্ত বিশ্বাস চকিতার খোঁজ নিতে এলেন। তিনি অবশ্য কোনদিনও বেশি অ্যালকোহলিক নয় কিন্তু তাঁর উচ্চস্বরে কথা শুনে জীবনলাল বিরক্ত হলেন।

চকিতা একজন ব্রাইট ও ইয়াং লেডি। খুবই সফেসটিকেড তাকে নিজের ফার্মে আনবেন এ কথাও শুনিয়ে দিলেন সূর্যাস্ত বিশ্বাস।

ওরা চলে গেলে শ্যামল এল বাড়ীতে। শ্যামলকে ডেকে জীবনলাল বললেন, বোন যত বাজে লোকের সঙ্গে মেশে, তুমি দেখতে পার না?

শ্যামল আমতা আমতা করতে লাগল। সে সেই পরমেশ্বরের ব্যাপারের পর বোনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, সে কথা সে ভাবল।

জীবনলাল বললেন, নীলম ও সূর্যাস্তর কথা। দুটি লোকই পয়সা-ওলা বিজনেস ম্যান কিন্তু আমার দেখে মনে হয়, চকিতার চারিত্রিক শুচিতা এরা রাখেনি। দে আর অলস্ হামবাক অ্যাণ্ড ফুলস।

শ্যামল বলতে গেল, বাবা আপনি যা মনে করছেন, চকিতা অতো চিপ নয়। সে তার প্রকেটশান ঠিকই নেয় কিন্তু জীবনলাল ধমকে থামিয়ে দিলেন, তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে নিজেরা যা বোঝ, মনে কর সেই ঠিক। আসলে তোমরা ভুল পথ গ্রহণ কর। আর বড়দের অপমান কর।

শ্যামল অপমানিত হয়ে বাবার সামনে থেকে সরে গেল। তারপর অনেক পরে বাইরে ট্যাক্সি থামল, আর চকিতা বাড়ীতে ঢুকল।

চকিতাকে দেখে শ্যামল বলল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকলি কেন? একেবারে রাতটা শেষ করে আসতে পারতিস তো!

চকিতা একেই বিধ্বস্ত ছিল। ট্যাক্সিতে সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে, মেয়েরা শারীরিক বল কেন পায় না? পুরুষ কায়দা পেলেই মেয়েদের আক্রমণ করে। মেয়েরা কোন ভাবেই নিজেদের বাঁচাতে পারে না। ঐ জংলী বিশাল দস্যুটাও লোভের হাতছানি দিয়ে কেমন তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। রাম মাথায় ডাঙ্গা মা'ল বলে, না হলে সে কি ঐ দানবের হাত থেকে রেহাই পেত? এই যখন তাদের অবস্থা, তখন এই পুরুষশাসিত সমাজে একক জীবন নিয়ে থাকা!

এই বেপথু চিন্তার মধ্যেই শ্যামলের কটুক্তি তাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। চোখ পাকিয়ে বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?

যা বলেছি তুমি শুনতে পাওনি এমন তো নয়।

রাত কাটিয়ে বাড়ী এলে বুঝি খুশি হতে?

খুশি অখুশি আমার জানার দরকার নেই। এ বাড়ীর গার্জেনকে গিয়ে তার কৈফিয়ৎ দাও।

গার্জেন তো বাবা, বাবাকে আমার কিছু বলার নেই।

বলার আছে কিনা আছে নিজে গিয়ে দেখো, তিনি কেশর ফুলিয়ে অপেক্ষা করছেন।

তাহলে তোমার এত কথার দরকার কি ছিল?

কোনই দরকার থাকত না, যদি অভিভাবক ডেকে না বলতেন, বোনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না?

দাদার সঙ্গে কথা বলা আর সমীচিন মনে করল না, সে নিজের ঘরের দিকে গেল।

জীবনলাল যেন ওৎ পেতে ছিলেন, বজ্র গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, শোন।

চকিতা ফিরে দাঁড়াল। কি ভেবেছ কি এটা হোটেলখানা না ধর্মশালা?

চকিতাও আজ সমান তেজী, যে কোন একটা, কি বলতে চাইছ তুমি?

তোমার খোঁজে বাইরের লোক এখানে এসে হামলা করে কেন?

কে এখানে এসেছে?

কে এক নীলম বাজপেয়ী, সূর্যাস্ত বিশ্বাস। দে আর ফুলস্ অ্যাণ্ড ড্রাঙ্কার। তুমি পড়াশুনা শিখে এই সব হাগার্সের সঙ্গে মেশো!

বাবা তুমি অধ্যাপক হতে পার কিন্তু ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পার না। যাদের তুমি হাগার্স বললে তারা তোমাকে কিনতে পারে।

এত বড় কথা? বেরিয়ে যা, আমার বাড়ী থেকে এখুনি বেরিয়ে যাবি। জীবনলাল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলেন।

চকিতাও আজ মরীয়া, বলল, তার জন্যে তোমায় বাবা এত গলাবাজী করতে হবে না। চকিতা তোমার মেয়ে, বাপের মতোই অহঙ্কারী, সে তোমার কথা রাখবে।

আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা করবে বলেই বিয়েতে বসলে না!

তাহলে বাবা স্পষ্ট একটা কথা তুমি শোন। যদিও মেয়ের মুখে শুনতে খারাপ লাগবে। আজ তো আমরা আর ছোটটি নই। মাকে দেখে আমি বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়।

তার মানে? মানু কি করেছে? জীবনলাল হতবুদ্ধি হলেন।

মা কিছুই করেনি। মাকে করানো হয়েছে। মা এই সংসারে এসে তোমার অত্যাচারে মূক হয়ে গেছে। তোমার দাপটে মা শুধু তোমার চালানো একটি যন্ত্র। তোমরা এই পুরুষশাসিত সমাজে নিজেরাই দাপট দেখিয়ে মেয়েদের কুক্ষিগত করে রেখেছ। মায়ের এই অসহায়তার জন্যেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে করব না। আমি একটি পুরুষের পোষা ময়না হয়ে খাঁচায় বদ্ধ হব না।

জীবনলাল একজন দার্শনিক তত্ত্বের মানুষ, মেয়ের এই সব তাৎক্ষণিক কথা শুনে হতবুদ্ধি হলেন, বললেন, এ সমস্যা তো তোমার একার নয়, সব সংসারেই ঘটছে। পুরুষই সংসারের কর্তা, পুরুষের অধীনেই সমাজ চলছে।

এই চলছেটা আমরা শিক্ষিত মেয়েরা আর চলতে দেব না। আমরা

মেয়েরা শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে থাকতে রাজী নই। এই যে তুমিই বলো না বাবা, সন্তান ধারণের জন্যে মাকে প্রতিদিন যে অত্যাচার করেছ, আজও করছ, একবারও কি ভাবো মাও মানুষ? না ওরা মেয়েমানুষ, ওরা কোনই প্রতিবাদ করতে পারবে না। ওদের শরীর, মন ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না।

তোমায় দেখছি পড়াশুনা শেখানোই কাল হয়েছে।

হাঁ বাবা সত্যিই কাল হয়েছে। আমার চোখ খুলে গেছে বলে আর চোখ বন্ধ করতে পারছি না, সেইজন্যে তোমাদের কথাও মেনে নিতে বাঁধছে।

তাহলে তুমি ঠিকই করেছ, বিয়ে করবে না। কিন্তু বিয়ে না করলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে এটা কি ভেবেছ?

হাঁ আমার পবিত্রতা নিয়ে অনেক কথা রটবে। তবে দেখা যাক্ আমি আমার শপথ রাখতে পারি কি না?

মূহুর্তে চকিতা নিজের ঘরে গিয়ে সুটকেস গুছিয়ে নিল। সুটকেস অনেক দিন ধরেই গোছানো ছিল, ড্রেসিং টেবিল থেকে সাজার জিনিষ-গুলি ও আলনা থেকে কটা কাপড় জামা ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল।

মানসী এসে হাত ধরলেন, এত রাত্রে কোথায় যাবি চকিতা, মাথা ঠাণ্ডা কর, ঘরে চল্।

না মা, আমাকে যেতে বাধা দিও না। আমি এই দেখতে চাই আমি একটি কুমারী মেয়ে, আমি এই পুরুষশাসিত সমাজে নিজের পবিত্রতা নিয়ে একা একা অভিভাবকহীন ছাড়াই চলতে পারি কিনা!

জীবনলাল ঘর থেকে বললেন, ওকে যেতে দাও মানু, ওর পাখনা গজিয়েছে। তবে বলে দাও, মুখ পুড়িয়ে যেন এ পথে আর না আসে।

চকিতা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শুধু দূর ঘরের দিকে একবার তাকাল।

মানসী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

৯

লেডিজ হোস্টেল প্রত্যহ নটাতেই বন্ধ হয়ে যায়। মিসেস গোঙানিও শুয়ে পড়েন নটায়। কেউ যদি পরে আসে আগে আবেদন রেখে যায় তাহলে মিসেস গোঙানি দরওয়ান কিশোরীলালকে ডেকে বলে দেন। সে এলে কিশোরীলাল খুলে দেয়। তবে 'এই দেরীতে আসব' কথাটা মিসেস গোঙানিকে অনেকেই বলতে চায় না কারণ তিনি সন্দিগ্ধচোখে এমন জেরা করতে শুরু করেন যে আবেদনকারীর অস্বস্তি হয়। হয়ত দূর কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যেতে হবে, ফিরতে দেরী হতে পারে। এই আত্মীয় কেমন, নিকট না দূর না আলাপী, অনেক সওয়াল মিসেস গোঙানি করেন। মেয়েরা তো কলেজের ছাত্রী নয় যে এত কৈফিয়তের উত্তর দেবে। তারা ওয়ার্কিং গার্ল, সার্ভিস করে, এত গার্জেনীপনা কেন শুনবে?

কিন্তু উপায় নেই মেয়েদের নিরাপদ হোস্টেল পাওয়া খুব শক্ত, তাই এই দাপটও নির্বিশেষে সহ্য করে।

কিশোরীলাল দরোয়ান, বিক্রম পরিচারক, উমাশশী মধ্যবয়স্কা পরিচারিকা ও ঠাকুর বনমালী এই নিয়ে এ হোস্টেলের সংসার।

রাত্রিবেলা যেমন কিশোরীলাল জেগে থাকে, বিক্রমও থাকে। নটার মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে যায় বলে মেয়েরা তো শুয়ে পড়ে না। তারা কেউ জল চায়, কেউ কফি করে দিতে বলে। কেউ সকালে উঠবে তার ফরমাস দেয়। ছটার পর থেকে মেয়েরা কাজ করে ফিরে এলেই মুহুর্মুহু শোনা যায় বিক্রমের নাম। কেউ ডাকছে সুর করে, ও বাবা বি-ক্র-ম। কেউ গর্জন করে এই বিক্রম। বিক্রমকে নিচে ওপরে আটখানি ঘরে চরকির মত ঘুরতে হয়। তবে ওর একটা স্বভাব কখনও রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করে না। সব সময়ে হাসিটি মুখে লেগে আছে। এই দাঁত ঝিকিয়ে হাসির জন্যে মেয়েরা খুব পছন্দ করে। কোন কোন মেয়ের তো মেজাজ ভাল থাকলে ইয়ারর্কি করে বলে, বিক্রম জানিস আমি

তোর প্রেমে পড়ে গেছি। আমায় বিয়ে করবি ? বিক্রমের বয়স একে-বারে কম নয় চব্বিশ চলছে। একটু বেঁটে ধরণের চেহারা বলে উনিশ কুড়ি মনে হয়। তার ওপর মুখে এখনও দাড়িগোঁফ গজায় নি। অল্প অল্প রোয়া উঠেছে থুতনি ও গোঁফে। ঠিক মেয়েদের মত মুখ। লম্বাটে শ্যামলা মুখের সবচেয়ে দৃশ্যমান তার মুক্তোর মতো দাঁত।

বিক্রম এখানে এসেছিল অনেক ছোটটি, এখন সে যুবক হয়ে উঠেছে কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোন মেয়ের কোন অভিযোগ নেই। এমনকি তিন নম্বরের অনামিকা সাহা যার চেহারা দেখলেই শরীর কেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই উত্তপ্ত শরীরের ঐশ্বর্য নিয়ে সে দাপটে লোককে যা খুশি বলে। সেও কোন অভিযোগ জানায় না বিক্রম সম্বন্ধে।

এদের সকলকে বশ করেছে চকিতা। কিশোরীলাল থেকে শুরু করে ঠাকুর বনমালী পর্যন্ত চকিতা এলে লাফিয়ে ওঠে। অবশ্য ওদের লাফিয়ে ওঠার কারণ, গোপনে ওরা চকিতার কাছ থেকে টাকা পায়। শুধু টাকা নয়, ওর ব্যবহারও এই ভৃত্য শ্রেণীকে মুগ্ধ করে। তাই এরা চকিতা এলেই অভিযোগ করে, দিদিমণি কবে তুমি এ হোস্টেলে একেবারে আসবে।

আরও ওরা জেনেছে, দিদিমণি জীবনে কখনও বিয়ে করবে না। কারণ, পুরুষের হ্যাংলামো তার বরদাস্ত নয়। ওরা এই হোস্টেলের মেয়েদের তো দেখছে সব অ্যানমারেড বলে নাম লিখিয়েছে কিন্তু ভিজিটর যারা দেখা করতে আসে সবাই অল্পবয়সী যুবক। আর তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিজিটররুমে বসে আড্ডা মারে।

সেই জন্যে চকিতার মূল্য এই সব ভৃত্য শ্রেণীর কাছে খুব বেশি।

সেই চকিতাই ট্যাক্সি থেকে নেমে গেটের কলিংবেলে চাপ দিল। কিশোরীলাল নিজের ঘরে বসে তুলসীদাসের রামায়ণখানা খুলে বসে-ছিল। এক পাতা তখনও পড়ে নি, কলিংবেল বেজে উঠল। কলিংবেল কিশোরীলালের ঘরের বাইরের দরজাতেই লাগানো থাকে। এটা মিসেস গোভানির ব্যবস্থা। কলিংবেলের শব্দ শুনে কিশোরীলাল একটু বিস্মিত হল। কই আজ তো কারও দেরীতে আসার আবেদন

নেই। তবু সে চুপ করে রইল আরও দু একবার বাজনাটা শোনবার অপেক্ষায়।

এবারে জোরে জোরে কবার বেজে উঠল। রাত তো কম হয়নি কিশোরীলাল নিজের ঘড়ি দেখল প্রায় সাড়ে এগারটা। এত রাত্রে কে এল মেয়ে হোস্টেলে? সে ধীর গতিতে চাবি হাতে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে কাঠের দরজা খুলল, খুলে উঁকি মারল। আর চকিতাকে দেখেই সে অবাক হয়ে গেল, দিদিমণি তুমি?

কিশোরীলাল আর অপেক্ষা করল না, তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে কোলাপসেবল গেট খুলল।

সামনে পায়ের কাছে চকিতার সুটকেস, কিশোরীলাল তাড়াতাড়ি সুটকেস তুলে নিল, দিদি তাহলে একেবারে চলে এলে?

চকিতার কথা বলতে ভাল লাগছিল না, তবু হেসে বলল, হাঁ কিশোরীলাল।

বেশ ভাল হইছে দিদিমণি। তাহলে বাড়ীর সঙ্গে সব খতম করে দিয়ে এলে?

এরা সবাই একরকম জানে চকিতার কাহিনী। চকিতা আর সে কথার জবাব না দিয়ে চলতে লাগল।

কিশোরীলাল ততক্ষণে গেট বন্ধ করে চকিতার সুটকেস নিয়ে তার পাশে।

চকিতা চলতে চলতে বলল, বাড়ী দেখছি তো একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

তা হবে না দিদি। রাত কত হইছে দেখো।

প্যাসেজের চল্লিশ পাওয়ারের কটি লাইট ছাড়া সবই অন্ধকার। চকিতার চলতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। এ সময়ে কোনদিন তো এখানে আসে নি। এক জায়গায় হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এত কম আলো কেন কিশোরীলাল?

বাহ দিদিমনি বললেন ভালো। রাত কত হইছে দেখলেন না। এখনও আলো জ্বালা থাকবে? তাও তো কটা আছে, নিশ্চয় বিক্রম

ঠাকুরের কাজ শেষ হয়নি। সুপার জানতে পারলেই চিল্লোবেন।

তোমাদের রাতে প্যাসেজে একটাও আলো জ্বলে না!

একঠো ভি না।

মেয়েরা যদি কেউ বাথরুমে যায়!

টর্চ জ্বালিয়ে যাবেন।

ওরা এসে আটনম্বরের সামনে দাঁড়াল। দরজা ধাক্কাতেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। সুজাতা মল্লিক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি কে এসেছে? একেও চকিতা বশ করেছে। একই পদ্ধতি। সুজাতা মল্লিককে হোস্টেল ছেড়ে দেয়ার নোটিশ ছিল। সিট তিনমাসের বাকী ছিল, সব চকিতা দিয়ে দিয়েছে। নোটিশও তুলিয়ে দিয়েছে। মিসেস গোঙানিকে সে কথা দিয়েছে ওর ভার আমি নিলাম, আপনাকে ভাবতে হবে না!

সেই থেকে সুজাতা মল্লিকের প্রিয় চকিতাদি। চকিতা মাঝে মাঝে হোস্টেলে এসে একে অনেক সংস্কার করেছে। পুরুষের থাবা থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। সুজাতাও হাঁফ ছেড়েছে, বাবা তুটি খাবার জন্যে কি সব নোংরা কাজ করতে হত। অনেক জিনিষ চকিতা কিনে দিয়েছে। পাউরুটি, মাখন, বিস্কুট, কফি, চা চিনি। সব সুজাতার হেফাজতে।

কিশোরীলাল সুটকেস তুলে ঘরে রাখতে সুজাতা হুররে দিয়ে উঠল, তুমি চকিতাদি একেবারে চলে এলে?

কিশোরীলালই উত্তর দিল, দেখছেন কি সুজাতাদি, এবার হোস্টেলে একটা বড়া ভোজ হইয়ে যাবে।

কোত্থেকে বিক্রম এসে উদয় হল, সে তো শুধু হাসে। কথা কম বলে সে দাঁত ঝিকিয়ে হাসতে লাগল। তাকে দেখে চকিতা বলল, বিক্রম বাথরুমে জল আছে?

এই সময়ে চকিতার চোখ পড়ল বিপরীত সিটের দিকে। একটা স্কার্ট পরা মেয়ে গুটি সুটি হয়ে বিছানায় ঘুমুচ্ছে। চকিতা ইসারায় জিজ্ঞাসা করল সুজাতাকে, কে রে?

সুজাতা ইসারায় বলল, পরে শুনো।

কিশোরীলাল চলে যেতে যেতে বলল, দিদি আমি আমার ঘরকে চললাম। কিছু দরকার হলে বলো আমি জেগেই আছি।

বিক্রম আগেই সরে গিয়েছিল। কিশোরীলালও গেল। সুজাতা দরজা বন্ধ করল।

চকিতা সুজাতার বিছানায় বসে বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পারবি?

কেন পারব না? কাল তুমি যা এনেছিলে সবই তো আছে। পাউরুটি, কেক, মাখন কলা।

ঠিক আছে তুই একটু কফি বানা, আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। আজ ভীষণ টায়ার্ড জানিস্?

হঠাৎ ওর চোখ গেল স্কার্ট পরা মেয়েটির দিকে। এতক্ষণ গুটি সুটি হয়ে শুয়েছিল, শোভন ছিল। এখন পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে শুতে ওর চোখে ভ্রুকুটি ফুটল।

একে তো স্কার্ট পরা মেয়ের বয়স্ক পা দুটি খোলা, তার ওপর ভেতরে ছোট্ট পান্টি থাকার জন্যে একেবারেই উদম মনে হয়। ফর্সা শরীরের এই ভারী উরু বের করা থাই দেখে কেমন শরীরের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল চকিতার।

সুজাতার দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল, এ মাল এলো কোত্থেকে!

মাল বলতে সুজাতা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলেছ ভাল চকিতাদি, মালই বটে। কোন লেডিস সেলুনে হেয়ার ড্রেসারের চাকরী করে। চীনা মেয়ে, নাম জিনা থাম। এসেছে কাল তুমি চলে যাবার পর। খুব ভুল ইংরিজী বলে, হিন্দীও তাই। আর খুব ফটফট করে। আমাকে তো এসেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাজেহাল করে দিল। ঠাকুর বনমালীর সঙ্গে লেগেছে দুবার, উমাশশীর সঙ্গে তিনবার। প্রতি কথায় ব্লাডি বাস্টার্ড ছাড়া কথা নেই। জামা ছাড়ে সবার সামনে।

সুজাতার কথা শুনতে শুনতে জিনা থামের দিকে তাকিয়ে ছিল চকিতা। নাক বোঁচা, চোখ ছোট বাটি মুখের একটি মেয়ে। ঠোঁট দুটি বেশ পাতলা ও রক্তাভ। বয়কাট চুল, হাতে গলায়, কানে কোন

গয়না নেই। সম্পূর্ণ ছেলের মত হাবভাব। সুজাতা তখন খাটের তলা থেকে ষ্টোভ বের করতে ব্যস্ত। হঠাৎ সেই দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল চকিতা। সুটকেস খুলে তোয়ালে, সাবান, ম্যাক্সি বের করে নিল। তারপর বাথরুমে যেতে যেতে বলল, সুজাতা দেরী কর না যেন। খাব আর শোব। ভীষণ টায়ার্ড।

দরজার মুখে বিক্রম উদয় হল।—দিদিমণি ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল, রুটি আছে আপনি খাবেন?

এখনও রুটি তরকারী, বলিস কি বিক্রম?

বিক্রম দাঁত ঝিকিয়ে হেসে বলল, বোর্ডাররা সব দিন তো খায় না। তাই বাড়তি হয়ই।

বাড়তিটা যে এ ভাবে আসে না তাও অজানা নয় কিন্তু ঐ যে চকিতা বলে কথা। চকিতা প্রসন্নদৃষ্টিতে বলল, তোরা যখন খাওয়াতে চাস না করব না।

নিজের সিটে শুয়ে ঘুমবার চেষ্টা করলেও সহজে ঘুম এল না চকিতার। হাজার ভাবনা এসে তাকে ভীড় করে দাঁড়াল। বিশেষ করে অনির্বাণের ওখানে সেই দৈত্যের আক্রমণ। লোকটি এমনি বৃদ্ধ কিন্তু মেয়েদের প্রতি কিরকম লালসা। প্রথম থেকেই চকিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিল। এমনি দৃষ্টির ফলা ইয়াং মেয়েদের সর্বদা নিতে হয়। কিন্তু কেন? মেয়েরা কি জন্তু? তাদের দেখলেই আক্রমণ করতে হবে। ভগবান তাদের রূপ, যৌবন দিয়েছেন। সে কি শুধু এইজন্যে? খুবই নিজেকে হীনমন্যা মনে হল চকিতার। ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব পুরুষের মধ্যেই এই আসক্তি। কিন্তু কেন কেন কেন? চকিতা খুবই শক্ত স্বভাবের মেয়ে, তবু শয্যায় শুয়ে খুবই অসহায় বোধ করল। বাপের কথায় তার এতটুকু অপমান লাগে নি। অভিভাবক সংসারের নিয়মকানুন তো দেখছেন, ভীত হবেন। অনূঢ়া কন্যা বিবাহ না করে কুমারী জীবন নিয়ে একা থাকবে? এ যে সম্ভব নয় সবার জানা। কিন্তু সেই সম্ভবটাই চকিতা সম্ভব করবে! কিন্তু কি ভাবে? এটাই চকিতা এখন ভেবে চলেছে। মেয়েদের শারীরিক শক্তি একেবারে

নেই। সেই শক্তিটা বাড়ালে কেমন হয়? কেউ আক্রমণ করতে এলেই তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

পরদিন সকালে সকলে ওঠার আগে সে উঠে পড়ল। তার খুব ভোর বেলায় ওঠা অভ্যাস। ম্যাক্সির নিচে হলুদ রঙের একটা পা টেপা প্যান্টি ছিল সেটা পরে বুকে বেসিয়ারটা এঁটে নিল। তারপর ম্যাক্সি সরিয়ে সে ব্যায়ামে মন দিল। আগে কিশোরী বেলায় একটা ব্যায়ামগারে কিছু কসরৎ শিখেছিল, সেগুলি ভোলে নি। প্রথমে দশটা ডন দেবার চেষ্টা করল। নিজের খাটের ধারটা ধরে হাতের ভর দিয়ে বুকটা নামিয়ে দিল কিন্তু ছু চারটি দিতে কেমন হাঁফ ধরল। একটু অপেক্ষা করে আবার এক সঙ্গে অনেকগুলি দিল। যখন থামল দেখল, চারজোড়া চোখ তাকে গিলে খাচ্ছে।

চকিতার মেয়েলী স্বাস্থ্য খুবই ভরাট। হাত, পা, বুক, নিতম্ব, উরু সব ছবির মতো। যে কোন মেয়ে এমন স্বাস্থ্য পেলে অহঙ্কারী হয়। এখন সেই স্বাস্থ্যের সব ঐশ্বর্য উন্মুক্ত! ডন দেবার মুহূর্তে তানপুরার ডৌল নামছিল আর উঠছিল। তাছাড়া বুকের দুই ডৌলও ঝুলে গিয়ে উঠে চওড়া হয়ে যাচ্ছিল। চকিতা ডন দেওয়া শেষ করে দাঁড়াতে নিঃশ্বাস ওঠা নামায় ব্রেসিয়ার স্থানচ্যুত হয়ে বুকের ভরাট গোলাপী গোলাকার বাইরে বেরিয়ে এল।

সুজাতা কিছু বলার আগে সেই জিনা থাম বলল, ব্লাডি বাস্টার্ড তুমি কে আছ? এমন নেকেড হয়ে কি করছ?

ব্লাডি বাস্টার্ড আমি চকিতা আছি। তুমি কে আছ উল্লুক।

তুমি আমাকে গালাগালি দিচ্ছ কেন সোয়াইন।

তোমাকে আমি পুজো করব।

হঠাৎ লাফিয়ে ছুটে এল জিনা থাম। একটা ঘুষি মারতে গেল চকিতাকে।

চকিতা খপ করে ওর একটা হাত ধরে মুচড়ে দিল।

উফ বলে আবার বিপরীত হাত চালাতে গেল। সেটা চকিতা ধরে মুচড়ে দিল।

এই দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে জিনা থাম ছেড়ে দিয়ে তার সিটে বসে পড়ল। হাত দুটোয় যে ব্যথা লেগেছে বোঝা গেল। দুটো হাত টিপতে টিপতে রাগে মাথা নত করল।

চকিতা দেখল মেয়েটি উচিত শিক্ষা পেয়েছে। সে খুব খুশিই হল। এমনি পুরুষগুলি এলে যেদিন হাত মুচড়ে দিতে পারবে, সেদিন যে কি খুশি হবে। এ মেয়েটি মেয়ে বলে অসুবিধা হল না, যতই কাঠ খোট্টা চীনা হোক তবু তো মেয়ে। ওর চেয়ে চকিতা শক্তি ধরে বেশি কিন্তু পুরুষের শক্ত ভারী চেহারা, তাদের ঘায়েল করতে গেলে অনেক অনেক শক্তি দরকার। চকিতা এখন তারই সাধনা করবে।

চকিতা বৈঠক দেবে বলে রেডি হচ্ছিল হঠাৎ জিনা কিছু বললো। চকিতা সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে জোরে জোরে বৈঠক দিতে লাগল। বৈঠক শেষ হলে হাঁফাতে হাঁফাতে জিনার দিকে তাকাল। জিনা তখন প্রশংসিত চোখে চকিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

হাউ বিউটিফুল অ্যাণ্ড চারমিং য়ু আর।

অ্যাণ্ড অলশো ব্লাডি বাষ্টার্ড।

নো নো ফ্রেণ্ড।

চকিতা সুজাতার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। কেন মেমসাহেব আরও গালাগালি দাও।

নো নো ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট বলে জিনা হাতটা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডসেকের জন্যে।

চকিতা হেসে গড়িয়ে পড়ল, হ্যাণ্ডসেক করতে চায়।

তুমি হাসছ কেন চোকিটা?

চোকিটা! আবার হো হো করে হেসে উঠল চকিতা। বাহ চীনা মেমসাহেবের উচ্চারণ তো খুব ভাল।

মেমসাহেব বলছ কেন? জিনা, জিনা থাম বলো। চীনা আছে।

বেশ জিনা আমি তোমার বন্ধু হতে পারি কিন্তু তোমাকে ব্লাডি বাষ্টার্ড কথাটা ছাড়তে হবে।

চীনা মেয়ের হাসিও কদাকার। ময়লা ছোট ছোট দাঁতে এমন হাসল

যেন কান্না মনে হল। হেসে বলল, তুমি ক্যারাটে জুডো জানো চকিটা।

সেটা আবার কি জিনিস?

হঠাৎ জিনা উঠে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে হাত চালাতে লাগল, পা ছুঁড়তে লাগল। এই তালে সে কটা চকিতাকে লাথি কষিয়ে দিল।

চকিতা থামিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি এসব জানো?

জিনা লজ্জা পেয়ে বলল, এট্টু, এট্টু। কিছুদিন একটা জায়গায় শিখেছিলাম।

চকিতা দেখল এ জিনিসটি শিখলে অতি সহজে বলশালী পুরুষকেও ঘায়েল করা যায়। সে বলল, সেই জায়গাটায় আমায় নিয়ে যাবে?

তুমি শিখবে? জিনা আগ্রহান্বিত হল।

হাঁ।

ঠিক আছে থার্সডে আমার লিভ থাকে নিয়ে যাব। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল। ইস্ টু লেট। আমাকে হাফ অ্যাণ্ড আওয়ারের মধ্যে বেরতে হবে। দ্রুত জামা কাপড় তোয়ালে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তাহলে চকিতা কিছু মনে কর নি তো। উই আর ফেণ্ডস্।

জিনা চলে গেলে সুজাতা চকিতার দিকে তাকাল, তোমাকে যত দেখছি অবাক হয়ে যাচ্ছি চকিতাদি।

চকিতার ততক্ষণে ম্যাক্সি পরা হয়ে গেছে। সুজাতার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, কেনরে?

কত মেয়েই তো দেখলাম, এমন কাউকে কি দেখেছি?

চকিতা প্রশংসায় লজ্জা পেল, থাক্ থাক্ আর দর বাড়াস নি।

দর তোমার এমনি আছে। আচ্ছা আগে কি তুমি ব্যায়াম করতে?

সে খুব ছোটবেলায়।

এখন যে ব্যায়াম করছ? তোমার ফিগার তো ভাল, আবার ব্যায়ামের দরকার কি?

চকিতা চোখ নাচিয়ে বলল, এখন ব্যায়াম করছি, সে একটা বিশেষ দরকারে।

সুজাতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বুঝলি না, তাহলে শোন, কাউকে বলিস না জেনো। যেসব পুরুষরা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে চায়, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করব বলে শক্তি সঞ্চয় করছি।

সুজাতা তবু অবাক হয়ে চকিতার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অনেকটা নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, পারবে?

কেন তোর অবিশ্বাস হচ্ছে! বলে এগিয়ে নিজের ব্যাগ খুলে সেই কয়েক মুখওলা ছুরিটা নিয়ে এল। বৃহৎ ফলাটা বের করে সুজাতার দিকে তাক করল।

সুজাতা বিস্ময়ে বলল, তুমি এই ছুরি নিয়ে ঘোরো?

চকিতা মাথা নেড়ে বলল, শুধু ঘুরি না, একবার তো এর পরীক্ষাও হয়ে গেছে। দাদার এক বন্ধু চাতুরী খেলে একটা খালি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমার শীলতাহানির চেষ্টা করেছিল, যখন জামা-কাপড় ছিঁড়ে ধস্তাধস্তি; হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই ছুরিটার কথা। সেটা বের করে ধরতেই সেই পুরুষ একেবারে কাৎ।

সুজাতা প্রশংসার চোখে চকিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

চকিতা হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বলল, কিরে এখন চাটা দেবে না?

দেবার তো কথা। বলে সুজাতা একটা অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করল, তুমি নয় চকিতাদি পুরুষদের এড়িয়ে চলবে কিন্তু তোমার যে শরীরে শত্রু আছে তার কি করবে?

অর্থাৎ! চকিতা বুঝতে না পেরে সুজাতার দিকে তাকাল।

সুজাতা একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, এই ধর না আমার কথা। তোমার কল্যাণে তো আমাকে আর বাইরে বেরুতে হয় না। কিন্তু এক একদিন রাত্রে কিছুতে ঘুমতে পারি না। শরীরটা যে কি আনচান করে। কেবলই মনে হয় কেউ চেপে পিষে ধরলে বুঝি শান্তি পাব। তোমার এমন হয় না?

নাতো!

কি জানি আমার বোধ হয় এমন হয়?

এ বোধ হয় তোমার কোন অসুখ।

না না চকিতাদি এ অসুখ নয়, এ যৌবনের ক্ষুধা।

হঠাৎ চকিতা উত্তেজিত হয়ে উঠল, ওসব ক্ষুধা টুধা ভোল তো! তুমিও আমার সঙ্গে যুযুৎসু শিখবে। পুরুষকে ঘায়েল করতেই হবে। আমরা ওদের হাতে খেলার পুতুল হব না।

কথার মাঝখানেই ট্রে হাতে বিক্রম উদয় হল, সঙ্গে চা, টোষ্ট।

চকিতা দেখে বলল, এসেছ বিক্রমবাবু, এতো দেরী করে আসলে কেন?

বিক্রম দাঁত ঝিকিয়ে হেসে বলল, দেরী কোথায় দিদি, এই সময় তো আসি।

কিশোরীলাল উঁকি মারল। দিদি!

কি কিশোরীলাল।

আজ তাহলে ভোজ হোবে।

চকিতা মুহূর্তে ভেবে নিল। আজ সে অফিস যাবে না। নীলম বাজপেয়ী জানে সে অসুস্থ। একদিন কামাই করে আরও তাকে উদ্বিগ্ন করা যাক্। কৌশল না করলে এ জগতে বাঁচা যায় না। কিশোরীর দিকে তাকিয়ে বলল, লাগাও ভোজ।

লেকিন সুপারের সঙ্গে আপনি একটু বাতবিত করে নিন।

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

১০

অর্চনা চকিতার বন্ধু। স্কুল, কলেজ জীবন একসঙ্গে কাটিয়েছে। দুজনের প্রথম আলাপ বোধ হয় তখন ওদের বয়স ছয়। চকিতা একটু ভাল রেজাল্ট করত, অর্চনা মাঝামাঝি কিন্তু ওদের বন্ধুত্ব তার জন্যে আটকায় নি। তারপর যখন ওরা বড় হল, দেখা গেল দুজনে দুরকম মানসিকতা পেয়েছে। শুধু মানসিকতা নয় শরীরও। চকিতা যত

সুন্দর হতে লাগল ওর অহঙ্কার তত বাড়তে লাগল। ছেলেরা কলেজ জীবনে ওর সঙ্গে ভাব করতে আসে বেশি। ও তাদের কটু কথা শুনিয়ে দেয়, একজন তো একটু বেশি বেশি এগিয়েছিল হাত ধরে জ্যোতিষ চর্চা করতে গিয়েছিল, চকিতা পা থেকে চটি খুলে ঠাস ঠাস করে মেরেছিল।

ওর দিকে কেউ এগোলেই রেগে যায়। হ্যাংলা সব কুকুরের দল, আমাদের দেখে যেন জিব দিয়ে লালা ঝরে।

অর্চনা বন্ধুর কাণ্ড দেখে কেমন গুটিয়ে যায়। ওর দিকে কেউ ফিরে তাকায় না কিন্তু কেউ তাকালে ওঁর খুব ভাল লাগে। মেয়েদের দিকে তো ছেলেরা তাকাবেই এই তো বিধির বিধান। একটা মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলের বিয়ে হলেই তো একটা সংসার গড়ে ওঠে।

বিয়ের আগে একটু পূর্বরাগ এতো ভালো লাগবারই কথা। চকিতা যত ছেলেদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হতে লাগল, অর্চনা মনে মনে একটি ছেলেকেই কায়মনোবাক্যে চাইল। একটি অদেখা পুরুষের দেখা সে পাবে যাকে নিবিড় করে তার দেহ, মন, যৌবন সব দিয়ে দিতে পারবে। সেই পুরুষের ভালবাসার দেওয়া সন্তান তার গর্ভে আসবে।

এই ভাবনার কথা কোনদিনও সে বন্ধুকে বলেনি। বললে যে ভাল কথা শুনবেন না সে জানে। তবু একবার কি কথায় কথায় বন্ধুকে বলেছিল ; চকিতা তুই কি কোনদিনও বিয়ে করবি না ?

চকিতা কিছু না ভেবেই চটপট উত্তর দিয়েছিল, মাগো ঐসব হ্যাংলাদের ! ছিঃ।

ধর যদি কোন হ্যাংলা না হয়। বেশ সুশ্রী, মার্জিত, স্কলার কেউ তোকে বিয়ে করতে চাইল।

এরকম মিলবেই না। পুরুষমাত্রেই হ্যাংলা, সে মার্জিত, স্কলার যেই হোক। তাহলে তোকে একটা গল্প বলি শোন অর্চনা। বাবা তো ফিলোজফির প্রফেসর। বহু অধ্যাপক বন্ধু তাঁর কাছে আসেন। একদিন কি একটা দরকারে বাবার ঘরে ঢুকেছি, দেখি বাবার তিনজন

অধ্যাপক বন্ধু এমন করে তাকিয়ে রইলেন যেন ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে। সেইজন্যে স্কলার টলার ওসব আর আমাকে শোনাস্ নি, আমার ওদের জানা হয়ে গেছে।

সেই থেকে অর্চনা আর বন্ধুকে এসব নিয়ে কোন কথা বলে নি। তারপর ওর বোনরা বড় হয়ে ওঠে। যখনই অর্চনাদের বাড়ীতে চকিতা তার মতামত জানায়, টুকু, মূর্ছনা যেন তাড়া করে আসে।

তুমি তোমার মানসিকতা নিয়ে থাকো চকিতাদি। মেয়ে হয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশব না এ কেমন কথা? তাহলে আমরা জন্মেছি কেন?

চকিতাকে অর্চনার মা বাবাও আজকাল পছন্দ করে না। কিন্তু চকিতার তাতে কিছু এসে যায় না।

এই যখন পরিস্থিতি তখন অর্চনার বিয়ের সম্বন্ধ করলেন অর্চনার বাবা। মনটা স্বভাবতই কুমারী মেয়ের নেচে উঠল। তার তো মনের মধ্যে একজনের জন্যে ধ্যান অনেকদিন থেকে। তারপর শুনল, লোকটির আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল অর্চনার। তার মনের মানুষ সম্পূর্ণ নতুন নয়!

যাই হোক সুদীপ্ত হালদারকে দেখে অর্চনার খারাপ লাগল না। বরং নির্ভর করার মতো ব্যক্তিত্ব। ত্রিশ বছরের একটি ছিপছিপে যুবক হলে হয়ত এই নির্ভরতা আসত না।

আবার বাবা সম্মান করে বলতে লাগলেন, স্যার। আরও তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

স্যারই তো বটে। নিজের বাড়ী, নিজের গাড়ী, একটি মানী অফিসের মান্য গন্য অফিসার। স্যুট টাই পরা একজন সাহেব। তাকিয়ে থেকে প্রথম কথাই বললেন, আমি বড় একা, সঙ্গ দিতে পারবে তো!

অর্চনা কি বলবে শুধু মাথা নীচু করে নিল।

নানা লজ্জা পেলে হবে না। তুমি কলেজে পড়া মেয়ে, উত্তর দাও।

অর্চনা কোনদিনও বাকপটু নয়। উত্তর দিতে গিয়ে ঘেমে স্যারা হল।

তারপর গলা পরিস্কার করে উত্তর দিল, কেন সঙ্গ দিতে পারব না?

এই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। তখন ইচ্ছে করেই টুকু ও মূর্ছনাকে সামনে আসতে দেওয়া হয় নি।

সুদীপ্ত হালদার তারপর থেকে দু তিনদিন অন্তর আসতে লাগলেন। এসে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে যান। প্রথম প্রথম পরিতোষ বাবু উপস্থিত থাকতেন। একদিন সুদীপ্ত হালদারই বললেন, আপনাকে মিছে আমার সামনে বসে থাকতে হবে না, আপনি ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

অর্চনাকে থাকতেই হয়, যেহেতু ব্যাপারটা তারই কিন্তু ওর লক্ষ্য যায় শুধু তাকে দেখেই সুদীপ্ত হালদার খুশি নয়, টুকুমা মূর্ছনাকে তাঁর চাই। ওরা হৈ চৈ ধরণের মেয়ে, খুব জমে যায়। আর ওর লক্ষ্য যায়, সুদীপ্ত হালদার ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

কোনদিন হয়ত টুকু থাকল, দু বোনই চটপটে, কোন কথা তাদের পড়ে না। আর ওরা যখন দেখে একজন বয়স্ক লোক কেমন হ্যাংলাপনা করে।

সুদীপ্ত হালদার তাদের কাউকে পেলেই পাশে বসাবে। আর ঘনিষ্ঠ হয়ে নানান কথার প্যাঁচ তৈরি করবেন। টুকু একটু রেখে ঢেকে কথা বলে কিন্তু মূর্ছনার ওসব বালাই নেই। পাশে ঘন হয়ে বসলে লাফিয়ে উঠবে, কি মশাই আপনি আমার দিদিকে বিয়ে করবেন, তা আমার সঙ্গে কি?

ঐ সাহেব সাহেব রাশভারী লোকটা যেন কেমন মূর্ছনার বয়েসে নেমে আসে। হেসে বলবে, দিদিকে তো বিয়ে করব, তা তাকে তো পেয়েই গেছি। এসব তো বাড়তি, ছাড়ব কেন?

টুকুর ঠিক জবাব আসে না কিন্তু মূর্ছনা লাফিয়ে উঠে দূরে বসা অর্চনার পাশে বসে বলবে, ইস্ বাড়তি, আমরা যেন ফ্যাল্না।

সুদীপ্ত তত হেসে সেই ওর পাশে গিয়েই বসবে।

অর্চনার ঠিক এসব ভাল লাগে না। যদিও এটা ইয়ার্কি, তবু ওর মনে হয়, এর পিছনে সেই পুরুষের হ্যাংলামি কাজ করে। বার বার ওর চকিতার কথা মনে হয়, সে যা বলে যে খারাপ নয় এই সুদীপ্তই তার

প্রমাণ। মান্যগণ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক দেখে শ্রদ্ধা এসেছিল কিন্তু বোনেদের সঙ্গে হুড়োবৃত্তিতে তার মন আর সরল থাকে না।

যাইহোক সুদীপ্তর ইচ্ছায় ওদের রেজেষ্ট্রি হয়ে গেল। সমান ঘর সত্বেও রেজেষ্ট্রি হল কারণ সুদীপ্তর তাই ইচ্ছা।

বিয়ের আগের দিন একটা কাণ্ড ঘটল। যে ব্যাপারটা টুকুমা চেপে গিয়েছিল, মূর্ছনা চাপল না। আলাদা একটা নির্জন ঘর পেয়ে সুদীপ্ত মূর্ছনাকে চেপে ধরেছিল, আর ওর বুকে সুদীপ্তর ভারী হাত। কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে সেই গোপন ব্যাপার চিৎকার করে মূর্ছনা সবাইকে জানিয়ে দিল। অর্চনার বাবা পরিতোষ বাবু কিছু না বলতে পেরে সরে গেলেন। শুধু কল্যানী মেয়েকে ধমকে ঠাণ্ডা করলেন। কি সব যা তা বলছিস্ মূর্ছা। চুপ কর। চুপ কর।

মূর্ছনা তত জোরে চিল্লোয়, কেন চুপ করব? আমার বুকে হাত দেবে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি বলেছিলাম তোমার ও জামাই কিছুতে দিদিকে নিয়ে একা থাকতে পারবে না।

অর্চনার কানে সবই যায়। সে নিঃশব্দে চোখের জলে ভাসে। অনেকদিন ধরেই সুদীপ্তর এই ব্যবহার তার ভাল লাগে নি। তবু ইয়ার্কি বলে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু মূর্ছনা যা বললো সে কি ইয়ার্কি? সুদীপ্তর মনে পাপ বাসা বাঁধে নি? ওর বোনেদের অল্প বয়স, শরীরে যৌবনের জলুস স্বভাবতই একটু বেশি। যে কোন পুরুষ দেখলেই বেশ মুগ্ধ হবে কিন্তু তাই বলে সুদীপ্ত?

ও যখন বসে বসে কাঁদছিল, কল্যানী এসে বললেন, তোর আবার কি হল? তুই তো জানিস মূর্ছাটা এক নম্বরের ফাজিল। ও কি দেখতে কি দেখেছে? আমারই এখন লজ্জা করছে, সুদীপ্তর সামনে কি করে গিয়ে যে দাঁড়াব?

কিন্তু যত সময় যেতে লাগল, অর্চনার যেন মনে হল সে সুখী হবে না। তাকে বিয়ে করে ঐ লোকটা ঘরে রেখে অন্যত্র মেয়ে নিয়ে মজা লুটবে? হয়ত দেখা যাবে ঐ মূর্ছনার সঙ্গেই ঘুরছে। বোন বলেও সে বাদ দিতে পারল না। মেয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বী বোনও তো হয় অনেক

ক্ষেত্রে দেখা যায়।

দেখতে দেখতে দিন কাবার হয়ে বিয়ের দিন এসে গেল। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনে ভরে উঠল কিন্তু অর্চনার চোখের জল কিছুতে শুকোয় না।

আত্মীয় স্বজনরা ভাবল বিয়ে হয়ে পরের ঘরে চলে যাবে তো সেই জন্যে কাঁদছে। স্বাভাবিক ভেবে তারা সান্ত্বনা দিল।

কয়েকবার কল্যানী এসে দাঁত কড়মড় করে শাসন করলেন, কি লাগিয়ে ছিস্ অর্চনা? চোখে যে বাণ ডেকেছে।

টুকু, মূর্ছনা পাশ দিয়ে চলে যায়, কিছু বলে না, কঠিন মুখ। সন্ধ্যের সময় মেয়েরা অর্চনাকে সাজাতে বসল কিন্তু চোখে এত জল যে কাজল পরাতে পারল না। মুখরা মেয়ে বলল, তুমি যেন কি অর্চনাদি, পরের ঘরে কি কেউ যায় না, অতো কাঁদার কি আছে?

রসিক মেয়ে বলল, এখন কাঁদছে, তারপর যখন সেই মানুষটির সান্নিধ্য পাবে সব ভুলে যাবে। তখন বাপের বাড়ী কি আর অনাত্মীয় বাড়ী কি সব এক, হি-হি-হি।

যতই কথার আদান প্রদান হোক, যখন শোনা গেল বর বিয়ে করতে এসেছে, অর্চনা মাথা ঘুরে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। জল, পাখা, কনে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মেয়েরাই রটাল, অর্চনাদির কেউ আছে। তা বাপু যদি থাকেই স্পষ্ট করে বললেই তো পারত। লেখাপড়া জানা মেয়ে। জোর করে তো বিয়ে দেয় নি।

কল্যানীকেও অনেকেই জিজ্ঞাসা করল কিন্তু কল্যানী মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আবার দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন, খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে না!

অর্চনা মাথা নিচু করে শুকনো মুখে জানাল, বেশি হচ্ছে কিনা আমি জানি না, তবে এ বিয়ে বন্ধ করে দাও।

বন্ধ করে দাও বললেই বন্ধ হয়ে যাবে। সুদীপ্ত এসেছে না!

অর্চনা বিয়ের সাজ শরীর থেকে খুলতে লাগল, আমি ভেবে দেখেছি,

এ বিয়ে আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়।

অর্চনা! কল্যানী ধমকে উঠলেন।

বিয়ে বাড়ীতে এরকম ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা রটনা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে মেয়েরা, তারা শুধু মজা করতে এসেছে। এসবের জন্যে তো তৈরি ছিল না। আসল ঘটনা কেউ জানল না কিন্তু বহু ঘটনা পল্লবিত হয়ে ঐ উৎসব মুখরিত বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল।

পরিতোষ বাবুর কানেও ব্যাপারটা গেল। তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। কল্যানীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? অর্চনা নাকি বিয়ে করবে না।

কল্যানী স্বামীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই দু বোনের কাহিনীটাই বললেন। তোমার ঐ ছোট মেয়ে মূর্ছনার জন্যেই এই সব কাণ্ড ঘটল। ছেলেরা ও রকম একটু আধটু ইয়ার্কি করে। তাই বলে…।

যখন অর্চনা বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, সেই সময় চকিতা এল বিয়ে বাড়ীতে। সেও বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে ব্যাপারটা শুনল।

টুকু এসে তাকে ধরল। চকিতাদি ব্যাপারটা কি হয়েছে বলি।

টুকুর কাছ থেকে সব জানল চকিতা।

এই সময় কল্যাণী চকিতাকে দেখে যেন ভরসা পেলেন। তিনি ভুলে গেলেন একদিন চকিতাকে অপছন্দ করতেন। বললেন, তোমার ছোটবেলার বন্ধু, তুমি দেখ না মা যদি কিছু করতে পার।

অর্চনা বসেছিল একাই। এখন আর ঘরে কেউ নেই। বিয়ে হবে না জেনে যে যার সরে পড়েছে। অর্চনাও খুলে ফেলেছে বিয়ের সাজ। যোগিনী হয়ে চুপ করে বসে আসে। চকিতা ঢুকতেও খুব একটা আহ্বান করল না।

চকিতা শুধু পিছন ফিরে টুকুমাকে বললো, দরজা ভেজিয়েই তুই চলে যা। আর দেখবি কেউ যেন এ ঘরে না আসে।

টুকুমা চলে গেলে চকিতা বন্ধুর পাশে থেবড়ে বসলো। কিরে তোর মধ্যে কখনও তেজ ছিল জানতাম না তো!

অর্চনা আর ধৈর্য ধরতে পারল না, বন্ধুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল চকিতা, তারপর পিঠে হাত দিয়ে তাকে তুলল, তোর কষ্টটা কি আমাকে আগে বল্?

অর্চনা কাঁদতে কাঁদতে জানাল, যাকে আমি বিয়ে করব, সে যদি অন্য মেয়েদের নিয়ে এই সব করে, তাহলে জেনেশুনে তাকে বিয়ে করা যায়?

এই সব বলতে? চকিতা চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটল।

কেন মূর্ছনাকে কি করেছে শুনিস্ নি?

মুচকি একটু হাসল চকিতা, ওটা এমন কি?

যাহ ওটা কিছু না?

চকিতা মাথা নাড়ল, তারপর গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বলল, তুই বিয়ে করতে চাস্ তো! না একেবারেই জীবনে বিয়ে করবি না!

অর্চনা চুপ করে রইল।

যদি একেবারে বিয়ে না করিস্ তাহলে এ বিয়ে ভেঙে দে। আর যদি করিস্ তাহলে এ বিয়ে নাকচ করার কিছু নেই! ছেলেরা এমনি একটু করেই।

অর্চনা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, বিয়ের পরও এমনি করবে আমি ছেড়ে দেব।

দিবি না, লাগাম ধরে যদি রাশ আটকে রাখতে পারিস্, আমি তোকে একটা গোল্ডেন প্রাইজ দেব।

অর্চনা চুপ করে রইল।

চকিতা আবার বলল, জানিস্ অর্চনা আমরা ভগবানের মার খাওয়া এক দুর্লভ জীব। আমাদের শরীরে তিনি দিয়েছেন অফুরন্ত ঐশ্বর্য, আমরা পালাব কোথায়? এরই মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এরই মধ্যে বিপ্লব করতে হবে। তাহলে বিয়েতে যাবি তো!

অর্চনা মাথা নাড়ল।

আর বন্ধু হিসাবে উপদেশ দিচ্ছি, তেজটা বাঁচিয়ে রাখিস্। সুদীপ্তর

স্বভাব তো তোর জানা হল, তাকে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করিস্।

বাইরে টুকু দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল, চকিতা বেরিয়ে বলল, তোর দিদি রাজী হয়েছে, যা বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল্।

টুকু খুশি হয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি দাঁড়াও চকিতাদি, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে ?

আমার সঙ্গে কেন রে ?

আসছি এক মিনিট।

টুকু মাকে বলে এসে চকিতাকে নিয়ে অন্যত্র চললো। সম্পূর্ণ আড়াল জায়গায় গিয়ে কোন ভূমিকা না করেই বলল, চকিতাদি আমার চাকরীর কি হল ?

মেয়েরা আগে চাকরী করত না। তারা অন্তঃপুরে থেকে বড় হয়ে একদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসে স্বামীর ঘরে চলে যেত। আজ মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে এক গাদা পুরুষের মধ্যে অফিসে গিয়ে চাকরী করছে। পুরুষদের কাছে যারা ছিল দুর্লভ তারা আজ সহজ লভ্য হয়েছে। চকিতা চাকরী করতে গিয়ে সেইটা বেশি দেখছে। কত অল্পায়াসে পুরুষ মেয়েদের অপমান করে। যে সব মেয়েরা খুব কঠিন ধাতের, তারা এসব এড়িয়ে চলে কিন্তু সব সময়ে কি তা সম্ভব হয় ? এই তো আজই অফিস গিয়ে শুনল রিসেপসনিষ্ট মালবিকা রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেছে। ওকে চকিতার খুব ভাল লাগত। তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট মেয়েটি। ছিপছিপে এক হারা চেহারা, দাঁত ঝিকিয়ে হেসে আহ্বান করত। কণ্ঠটি ভারী সুন্দর। যেন গানের ছন্দে ইংরিজী বলত।

সেই মেয়েটি রেজিগনেশন দিয়েছে শুনে মাথা গরম হয়ে গেল। আরও পাঁচ, সাতটি মেয়ে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে কিছু জানা গেল না।

অথচ মেয়েটি চাকরী ছেড়ে দেবে এমন তো তার অবস্থা নয় ! কি এমন ঘটল ? তখন হঠাৎ নীলম বাজপেয়ীর স্বভাবের কথা মনে এল।

ও আর কিছু না ভেবে পেয়ে বসের ঘরে ঢুকে পড়ল। মিঃ বাজপেয়ী!

বাজপেয়ী কাজ করছিলেন, মুখে না তুলে বললেন, বলুন মিস চ্যাটার্জি।

রিসেপসনিষ্ট মালবিকা রেজিগনেশন দিল কেন?

নীলম বাজপেয়ী কাজ করতে করতে টেবিলে পড়ে থাকা একখানি কাগজ চকিতার দিকে এগিয়ে দিলেন।

চকিতা পড়ল মালবিকায় রেজিগনেশন লেটার। সে লিখেছে, অ্যানঅ্যাভয়েডেবল সারকামটান্সের জন্যে আমি রিজাইন করছি।

চকিতা কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এটা তো অফিসিয়াল লেটার কিন্তু মালবিকা তো হঠাৎ চাকরী ছেড়ে দিতে পারে না?

নীলম বাজপেয়ী কাজ করতে করতে চোখ না তুলেই বললেন, মিস চ্যাটার্জি আপনি কি বলতে চান বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনারও অন্য ষ্টাফ সম্বন্ধে ইণ্টারফিয়ার করা কি উচিৎ?

চকিতা একরকম অপমানিত হয়েই নীলম বাজপেয়ীর ঘর ছাড়ল। এবং তার স্থিরসিদ্ধান্ত এল, মালবিকার কাছে এমন কোন অপমানজনক প্রস্তাব এসেছিল, যার জন্যে সে বাধ্য হয়ে চাকরী ছেড়েছে।

অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সে লক্ষ্য করেছে, তাদের কোম্পানীর মালিকদের জন্যে আলাদা সব ফ্ল্যাট নেওয়া আছে। সেখানে তারা বিশ্রামের জন্যে বেশ সময় ব্যয় করেন। নীলম বাজ-পেয়ী তাঁর ফ্ল্যাটে চকিতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সে দেখেছে, আলনায়, শাড়ী, ম্যাক্সি রাখা আছে। সূর্যান্ত বিশ্বাসেরও ফ্ল্যাট আছে। সেখানে সে এখনও যায় নি।

তাই মেয়েদের চাকরী মানে জেনেশুনে ঘরে বিপদ ডেকে আনা। যে কোন সময়ে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

টুকুমা বলতে চকিতা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তুমি চাকরী করবে?

টুকু আগ্রহ সহকারে বলল, হ্যাঁ চকিতাদি।

আবার ওর ডাগর শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল, নিজেকে সামলাতে পারবে ?

টুকু না বুঝেই হেসে বলল, তা কেন পারব না ?

না পারবে না টুকু। ওর চেয়ে ওসব ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে একটা বিয়ে করে ফেলো। ফর দ্য সেভ অফ লাইফ।

টুকুমা ক্ষুব্ধ হল, তুমি করে দেবে না তাই বলো। জ্ঞান না দিলেও চলবে।

আমি জ্ঞান দিচ্ছি না টুকু। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

তুমি তো চাকরী করছ !

করছি কিন্তু আমার নিজেকে নিয়ে একটা পরীক্ষা আছে সেইজন্যে এগোচ্ছি।

আমিও সেই পরীক্ষা করতে চাই।

অর্থাৎ।

টুকু মাথা নীচু করে নিয়ে বলল, ছেলেদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে চকিতাদি।

তুমি সুদীপ্তর কথা বলছ ?

না। আমি একটা ছেলেকে ভাল বাসতাম। পাঁচ বছর তার সঙ্গে মিশেছি। তার চাকরী ছিল না, পরে চাকরী হয়েছে। আমরা দুজনে ঘর বাঁধব সব সেটেলড। হঠাৎ একদিন কুনাল আমাকে তার বন্ধুর একটি খালি বাড়ীতে নিয়ে গেল। আর কি প্রস্তাব করল জানো ?

চকিতা তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক্ থাক্। ঠিক আছে তুই যদি নিজেকে সামলাতে পারিস্, একটা ভেকেন্সি হয়েছে, রিসেপ-সনিষ্টের চাকরী আমাদের অফিসে। তুই আমার হোস্টেলে দেখা করিস্। নীলম বাজপেয়ীকে বলে দেখব।

নীচ থেকে কয়েক জোড়া শাঁখ বেজে উঠল, অর্থাৎ বিয়ে শুরু হয়েছে।

চকিতা ঘড়ি দেখল রাত প্রায় সাড়ে নটা। হোস্টেলে তার ফিরতে হবে। সে যাবার জন্যে ছটফট করল।

কল্যাণী আজ চকিতার ওপর খুব সদয়। নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন। বললেন, তুমি যে কত বড় উপকার করলে কি বলবো। তুমি না এলে কি যে হত এখন আর ভাবতে পারি না।

চকিতা যখন হোস্টেলে ফিরল যথারীতি সব বন্ধ। কলিংবেল দুবার বাজাতেই কিশোরীলাল এসে দরজা খুলে দিল। তার মুখ গম্ভীর, এমনি কিশোরীলাল খুব কথা বলে সে জায়গায় এই পরিবর্তন দেখে চকিতা একটু বিস্মিত হল। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, কিশোরীলাল তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় তো !

জী দিদি। লেকিন একটো গরবর হয়েছে।

চকিতা কিশোরীলালের দিকে তাকাল।

সুপার মেমসাহেব খুব গোঁসা করে এখনও অফিস ঘরে আপনার জন্যে বসে আছেন।

কেন কি হয়েছে কিশোরীলাল।

কে এক খতরনাক বাবু এসেছিল, আপনার নামে যা-তা বলে গেছেন। সেই থেকে মেমসাহেব খুব দাপাচ্ছেন।

খতরনাক বাবু? কেমন দেখতে?

দেখলে ভি সোজা আদমী মনে হয় না। বহুৎ লম্বা আদমী আছে। আঁখ ভি সিধা নেই।

অফিস ঘরে সত্যি তখন আলো জ্বলছিল। সেখানে মিসেস গোঙানি কি সব কাগজপত্তর লিখছিলেন। এত রাত্রে কখনও মিসেস গোঙানি অফিস ঘরে থাকেন না। চকিতা যতদিন এসেছে, দেখছে সুপার আটটা বাজলেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েন। কি এমন ঘোরতর কাণ্ড ঘটল, মিসেস গোঙানি অফিস ঘরে ?

কিশোরীলালকে ছেড়ে চকিতা অফিস ঘরের দিকেই গেল। মিসেস গোঙানির সঙ্গে তার ভাল সম্বন্ধ। তিনি চকিতাকে বেশ পছন্দ করেন। হোস্টেলের কাজে মেয়েদের সম্বন্ধে কত আলোচনা করেন। অনেক ডিসিশান নেবার আগে চকিতার সঙ্গে আলোচনা করে নেন। চকিতাও অনেক বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত জানায়। একরকম বন্ধুত্ব সম্বন্ধ।

সেই সম্বন্ধ মনে রেখেই চকিতা দরজার কাছে দাঁড়াল, আজকে আপনি এতক্ষণ ?

এই যে মিস চ্যাটার্জি, আপনি একটু এদিকে আসুন। মিসেস গোঙানির স্বর খুব গম্ভীর।

চকিতা কিছু বোঝার ভান না করে এগিয়ে গিয়ে সুপারের সামনের চেয়ারে বসল।

মিসেস গোঙানি বেশ রূঢ়স্বরেই বললেন, আমি আপনাকে একজন ভদ্র বিশিষ্ট মহিলা বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু যা শুনলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম।

প্রথমেই আক্রমণ ও অপমান জনক কথা শুনে চকিতা একটু দমে গেল কিন্তু ও এত যুদ্ধ করে পথ এগোচ্ছে যে দমবার পাত্রী নয়। মুখে অপমানের রঙ লাগলেও চেপে গিয়ে সুমিষ্ঠ স্বরে বলল, কে আপনাকে কি বলে গেছে স্পষ্ট করে বলুন মিসেস গোঙানি। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সে কথা পরে। আগে বলুন আপনি কারপটেড নন ! আপনাকে কোন একজন ধরে নিয়ে গিয়ে আপনার ভারজিনিটি নষ্ট করে নি ?

এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন কিন্তু হোস্টেলের রুল রেগুলেশনে আছে এসব প্রশ্ন সুপার করতে পারেন। এবং সুপার সন্তুষ্ট না হলে সেই বোর্ডারকে হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু মিসেস গোঙানি যে সব কথা বললেন, একটি মেয়ের কানে যে শোনা কত বিসদৃশ তা তার জানা নেই। যেন খুব সহজ এসব কথা।

চকিতা শক্ত মনের মেয়ে হলেও এসব কথা অন্যের মুখে শুনে একটু চমকাল। বেশ ধীর গতিতে বলল, আমি ভার্জিন কিনা আমার মুখ থেকে শুনলেই বিশ্বাস করবেন ?

মিসেস গোঙানি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, বলুন না শুনি।

আমি খুব স্পষ্ট বক্তা জানেন। আপনি এতদিন হোস্টেল চালাচ্ছেন, আপনি মেয়েদের মুখ দেখে বুঝতে পারেন না, কে ভার্জিন আর কে নয় ?

না ওসব বোঝা যায় না।

তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেমন করে?

যুক্তিপূর্ণ কথায় মিসেস গোঙানি একটু অস্বস্তিতে পড়লেন।

চকিতা তখনও কথা থামায় নি, বলল, আমি এতদিন যা আপনাকে বলে এসেছি নিশ্চয় আপনি তা ভুলে যান নি!

কিন্তু ঐ লোকটা যা বলে গেল সেও বা কি করে অবিশ্বাস করব?

অ্যানমারেড গার্লের নামে বহুলোক বহু কিছু বলে ফয়দা তুলতে চায়। তাদের বিপদে ফেলার লোক যে অনেক, এ কী আপনি একজন অভিজ্ঞ হয়ে জানেন না? লোকটা কে আপনি বলুন না!

সুপার টেবিলের ওপর একটা কাগজের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, পরমেশ্বর সিংহ।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের সেই ফাঁকা বাড়ীর দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে উঠল। একটু হজম করার পর চকিতাই কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কি বলে গেছে?

সে নাকি কায়দা করে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা বাড়ীতে রেপ করেছে।

না করে নি। পারে নি সে। চকিতা বেশ চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল। তারপর ব্যাগ থেকে সেই বহুমুখী ফলা বিদেশী ছুরিটাকে বের করে বোতাম টিপে ঝকমকে বড় ফলাটা সুপারের সামনে ধরল।

এই ছুরিটা দেখিয়েই আমি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

মনে মনে মিসেস গোঙানি খুশি হলেও বাইরের সে ভাব দেখালেন না। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, ঐ ছুরি দেখেই ঐ বলশালী পুরুষ ছেড়ে দিল? অ্যাই কাণ্ট বিলিভ।

হঠাৎ টেবিলের কোনে ফোনটার দিকে চকিতার লক্ষ্য গেল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় এগারটা। ফোনটা থাকে তার বাবার ঘরে। বাবা এখন পড়াশুনা করেন। দাদা নিজের ঘরে নিশ্চয় ঘুমোয় নি!

চকিতা বলল, আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে একটা ফোন

করতে পারি !

মিসেস গোঙানির হুকুমের অপেক্ষা না করেই সে ফোনটা তুলে ডায়াল করতে লাগল।

ওপাশ থেকে ফোন তুললেন বাবা। জীবনলাল স্পিকিং !

চকিতা নিজের গলা একটু বিকৃত করে বলল, শ্যামলকে একটু দিতে পারেন !

ধরুন।

কিছুক্ষণ পর দাদার গলা ভেসে এল।

দাদা আমি চকিতা ফোন করছি।

কিরে এত রাত্রে ?

চকিতা সে সব কথার মধ্যে না গিয়ে বলল, তুমি আবার কি লাগিয়েছ বলতে পার ?

কেন কি হয়েছে ?

পরমেশ্বরকে আমার হোস্টেলে পাঠিয়েছিলে কেন ?

আমি !

তুমি ছাড়া পরমেশ্বরের সাহস কেমন করে হয় ? সে এসে সুপারকে যা-তা বলে গেছে। সে নাকি আমাকে রেপ করেছে। আমার ভার্জিনিটি চলে গেছে ! হোস্টেল সুপারিনন্টেণ্ডেট আমার বোর্ডারশিপ ক্যানসেল করতে চান।

বিশ্বাস কর আমি এসব কিছুই জানি না।

ন্যাকা তুমি। তুমি বাইরে ভাল মানুষী দেখাও। ভেতরে ভেতরে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছ।

ওসব চিড়ে ভেজানো কথা আমাকে শুনিও না। আমি বিয়ে করব না, স্বাধীন ভাবে থাকব, এটা তোমারও মনঃপুত নয়। তা বোন নষ্ট এ কথাটা বলতে তোমার জিভে বাঁধে না !

তুই তো জানিস চকিতা, অ্যানমারেড মেয়েরা এমনি ঘুরে বেড়ালে তাদের ঐ সব ব্লেম দেয়ই। বেওয়ারিশ কথাটা তো ভুল নয়।

আমি তোমার কাছ থেকে অ্যাডভাইস চাই না। তুমি তোমার এই

কন্সপিরেসী বন্ধ করবে কিনা বলো।

ঠিক আছে আমি পরমেশ্বরকে বলে দেব।

তাই বলবে। ঝকাং করে ফোনটা রেখে দিল চকিতা। মিসেস গোঙানির দিকে তাকাল, বুঝলেন কিছু!

অ্যাই অ্যাম ভেরি সরি মিস চ্যাটার্জি।

মাই এল্ডার ব্রাদার ইজ টু ইনভলব উইথ দিজ কনস্‌পিরেসী, আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড!

সত্যি ভাবা যায় না। দিন দিন যেন পৃথিবীটা জঙ্গল হয়ে উঠছে।

ঘরে আসতে সুজাতা মল্লিক বলল, সুপারের সঙ্গে কি এমন গরম গরম কথা বলছিলে!

তুমি শুনেছ?

না ওপর থেকে একটু একটু শব্দ কানে আসছিল।

হঠাৎ পাশের বেডের জিনা থামের দিকে চোখ গেল চকিতার। মেয়েটা আজও শুয়েছে গায়ে কোন চাপা না দিয়ে। ফ্রক পরা হাঁটু বের করা চেহারা। ফ্রক উঠে প্যান্টি বেরিয়ে পড়েছে, ভারী ভারী উরুর মাঝে প্যান্টি পায়ের দুই খাঁজে চেপে বসেছে। খুব বিসদৃশ্য লাগছে। চকিতা বলে দিয়েছিল তুমি গায়ে চাপা দিয়ে শোবে। আজ শোয় নি দেখে সুজাতার দিকে তাকাল। সুজাতার চোখে হাসির কৌতুক।

মেয়েটা খুব অসভ্য আছে, না!

চীনা মেয়ে, তাও আবার সেলুনে কাজ করে।

ওকে ধাক্কা দাও তো!

সুজাতা উঠে গিয়ে ধাক্কা দিল। দু চার-বার ধাক্কা দিতে বিরক্ত হয়ে জিনা চোখ মেলল, ব্লাডি বাষ্টার্ড। ঘুম ভাঙালে কেন? তারপর চকিতার দিকে ওর চোখ পড়ল। চকিতাকে ও একটু সমীহ করে।

চকিতা বলল, আবার গালাগাল দিচ্ছ? হোয়াই ডু য়ু নট্‌ কভার য়োর বডি!

এখানে তো সব মেয়ে থাকে। বডি কভার করার দরকার কি?

তাবলে কি তুমি ল্যাংটো হয়ে থাকবে ?

আমি নেকেড হয়ে নেই।

ছোট প্যান্টি পরে শোও, নেকেড তো বটেই !

তোমরা কাপড় পরে শোও, তোমরা নেকেড হও না ! নিচে তো কিছু পরো না। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ সোজাতা সেদিন কাপড় উঠাকে শুয়েছিল।

সুজাতা লজ্জায় হেসে ফেলল, তুমি দেখেছ কিনা !

হা আমি সেদিন রাত দুটায় বাথরুম গেলুম, সেদিন।

এ সব ব্যাপারে চকিতা খুব সচেতন। সে রাত্রিবেলা লম্বা ম্যাক্সি পরে শোয় বটে কিন্তু ভেতরে অন্তরবাস পরে নেয়। ও বাড়ীতে একা ঘরে থাকতে এই অভ্যাস করেছিল।

সুজাতার লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে চকিতা জিনাকে থামিয়ে দিল। থামো থামো খুব হয়েছে।

জিনা উঠে বসেছিল, সেই দিকে তাকিয়ে চকিতা বলল, কাল তো থার্স´ডে তোমার ছুটি, সেই জুড়ো সেণ্টারে যাবে ?

জিনা কোন উৎসাহ দেখাল না, যেতে পারি।

চকিতা বুঝল জিনার মন সরিফ নয়, বলল, যেতে পারি বলছ কেন ?

জুড়ো, ক্যারাটে শিখে কি করবে ?

তোমায় ঘায়েল করব হোল তো !

আমি তো আর মরদ নয়।

তুমি মরদের বাবা।

সবই রসিকতার ছলে হচ্ছিল। এবার জিনা সহজ হয়ে হেসে ফেলল। তার হাসি তো কান্নারই মত।

চকিতা জামা কাপড় ছাড়ছিল। কাপড় ছেড়ে জামা খুলেছে, এই সময়ে জিনার ঐ হাসি শুনল। ব্রেসিয়ার পরা অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াল। এই চীনা হাসছিস কেন ?

চিনা হাসতে হাসতেই বলল, তুমি মরদের কাছ থেকে ছাড়া পাবে না এ আমি বলে দিলাম।

কেন রে? চকিতা ঝুঁকে জিনার দিকে তাকাল।

হাউ নাইস য়োর বডি।

এই থাপ্পর মারব।

থাপ্পর মারলে কি হবে? আমি যদি পুরুষ হতাম তোমায় কি এখুনি ছাড়তাম?

চকিতা জিব বের করে ভেঙিয়ে বলল, তুমি যদি পুরুষ হতে তাহলে কি তোমার সামনে এমনি কাপড় ছাড়তাম?

হিং-হি-হি।

সুজাতাও হেসে ফেলল।

এখন অনেক রাত। ঘর অন্ধকার। সুজাতা, জিনা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে গেছে কিন্তু চকিতার ঘুম আজ পালিয়েছে। সারাদিন সে প্রতিপক্ষর সঙ্গে প্রচুর যুদ্ধ করে কিন্তু এই রাত গভীর হলেই কেমন অসহায় বোধ করে। কেউ তার পাশে নেই। তাকে এই দুনিয়ার সঙ্গে একা লড়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কতদিন সে এমনি লড়ে যাবে? নীলম বাজপেয়ীর আজ ব্যবহারে বোঝা গেছে, তিনি তার ওপর খুশি নন। স্বাভাবিক। নীলম কি চায় যুবতী মেয়ের কি না বোঝার আছে! কিন্তু এইসব নীলমরা একবারও ভাবে না, কুমারী মেয়েরা কি এত শস্তা? ভাবে নিশ্চয় কিন্তু ঐ যে ওদের পারপাস সার্ভ না হলেই ওরা খেপে যায়। সূর্যাস্ত বিশ্বাসও তাই। কানের কাছে গুণ গুণ করে চলেছে। তুমি এ অফিস ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে ডবল মাইনা দেব। কিন্তু কেন আমাকে ডবল মাইনে দেবেন? চকিতা সবই জানে তবু না জানার ভান করে।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস আরও চালাক, ঘুরিয়ে কথা বলে, তুমি একজন বিউটিফুল ইয়াং লেডি। তোমাকে পাশে নিয়ে আমি পার্টিদের সঙ্গে কথা বললে তারা মুগ্ধ হয়ে যাবে না!

এটা খুবই সত্যি কথা চকিতা জানে।

নীলম যখন তাকে পাশে নিয়ে পার্টিদের সঙ্গে কথা বলে। পার্টিরা

তাকিয়ে থাকে তার শরীরের দিকে। এতেই থ্রি ফোর্থ কন্ট্রাক্ট ফাইনাল হয়ে যায়।

বিজনেস ছাড়াও যে বিজনেসম্যানদের আরও কিছু আছে, সেটা পার্সোনাল। সেই ব্যক্তিগত আসক্তি নিয়েই চকিতার মাথাব্যথা।

কিন্তু নীলমরা কেন ভাবে না, এইসব মেয়েরা কখনও তাদের প্রাইভেট ফ্ল্যাটে যাবে না। অবশ্য যায় না এমন নয়। যারা যায় তারা আরও কেরিয়ারিষ্ট কিন্তু এতদিনে কি নীলম বুঝতে পারেনি চকিতা অন্য ধাতের মেয়ে।

নারী শরীর নারীর নিজেরই শত্রু। কুরূপা, সুরূপা কেউই পরিত্রাণ পায় না এর হাত থেকে। সুদৃশ্য কোন বস্তু দেখলেই তো লোকে হাত বাড়াবে। কিন্তু চকিতার প্রশ্ন সেই সুদৃশ্য বস্তু যদি সচল হয়, তার নিজস্ব কি কোন ইচ্ছা নেই?

তার ওপর আছে আরও শত্রুতা। প্রত্যেক মাসে মেয়েদের এক বিশেষ অসুখে ভুগতে হয়। নাকি মেয়েদের মা হওয়ার এটা কলকাঠি। তারপর শরীরে এক আনচান ভাব সৃষ্টি হয়। তখন মনে হয় কেউ শরীরটা নিয়ে দলে পিষে দিলে আরাম হয়। এসব জিনিসের অনুভব তার আগে ছিল না। সেদিন সুজাতা বলতে খেয়াল হল। সে বলল, চকিতাদি তুমি তো আমাকে ওসব করতে দাও না কিন্তু আমার যে এক এক রাত্রে ঘুম আসে না। কেনরে? শরীরের মধ্যে কেমন মোচড় দেয়। তলপেটটা ব্যথা করে। বুক দুটো মোচড়ায়। চকিতা সুজাতাকে ধমক দিয়েছিল, যতসব বাজে চিন্তা, ছাড় তো ওসব।

কিন্তু সেই একদিন রাত্রে অনুভব করল চকিতা একটা তীব্র যন্ত্রণা। শরীর কেমন আছাড়ি পাছাড়ি করতে লাগল। উপুড় হয়ে শুল। মাথার বালিশটা পেটে চেপে ধরল। দুই বুকে যেন কেমন যন্ত্রণা। ওর মনে হল কেউ দলে পিষে দিলে ভাল লাগবে কারণ ও ধরনের অনুভূতি তার নেই। কিন্তু খুব খারাপ খারাপ চিন্তা তার মনে এল। পরমেশ্বর সেদিন যদি তাকে নগ্ন করে খাটে ফেলে পিষে ধরত। নীলমের ফ্ল্যাটের বেডরুমটা খুব সুন্দর। নীলমের পাশে নগ্ন হয়ে শুয়ে

আছে মনে হল। সে খুব ভাল ভাল কথা বলছে, আদর করছে। এইসব ভাবতে গিয়ে খুব অবাক লাগতে লাগল তার, আর তখনই সে লক্ষ্য করল শরীরের যন্ত্রণা কেমন কমছে।

মা বাবা তাড়াতাড়ি মেয়েদের কেন বিয়ে দেন, এই অনুভূতির পর তার বোধ হল। নারী শরীরের মধ্যেই নারীর শত্রু। আজও তেমনি শরীরে একটা যন্ত্রণা অনুভূত হতে লাগল। অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল। অর্চনা এরপর স্বামী সুখে এই যন্ত্রণা থেকে বঁাচবে।

তবে কি সে হঠাৎ মেজাজ দেখিয়ে ভুল পথ ধরল? কোন পুরুষকে সে কাছে ঘেষতে দেবে না! কেমন যেন এক কুমারী মেয়ে হেরে যাওয়ার মুহূর্তে এসে পেঁাচছে কিন্তু সেই বা কি করবে? কোন পুরুষ তো তাকে সত্যিকারের চায়নি। ভালবাসলে না হয় অন্য কথা ছিল। যারাই তার দিকে এগিয়ে এসেছে লোভের চোখে তার শরীরটার দিকে তাকিয়েছে। তখনই ঘেন্না হয়েছে তাদের।

১১

চকিতা কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সুজাতা দেখেছিস্?

কি চকিতাদি!

চকিতা তখন পুরো খবরটা পড়ায় ব্যস্ত। পড়া শেষ হলে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, উফ্ ভাবা যায় না। স্বামী, শ্বশুর, দেওর, দুই ননদ, শাশুড়ী সবাই মিলে মেয়েটাকে মেরে ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করতে গিয়েছিল, পুলিশ রিপোর্টে প্রমাণ হয়েছে হত্যা। একটা মেয়ে কত সাধ করে শ্বশুর বাড়ী গেল, কত স্বপ্ন মনে। চিন্তা করতে পারছ সুজাতা?

না চকিতাদি, ওরকম বিয়ে আমার কোনদিনও হবে না, তা চিন্তাও করি না।

ও বড়লোকেদের বাড়ীতে বেশি হয়। দেনাপাওনা ঠিক হয় না,

তাই বৌয়ের ওপর শোধ তোলে।

শুধুই দেনাপাওনা, আর কিছু নয়? যে ছেলেটা বিয়েটা করল, তার কি বিবেক বলে কিছু নেই?

সে যদি থাকত, তাহলে এত গোলমাল কি হত? আসলে চকিতাদি মেয়ে হয়ে জন্মটাই আমাদের পাপ।

কিন্তু মেয়ে না জন্মালে পৃথিবী চলত? মেয়ে মা না হলে সন্তান না ধরলে এই যে কোটি বছর পৃথিবী চলছে, চলত?

সে যাই বলো তুমি মেয়ে মানেই নরকের দ্বার। যেখানে একটা মেয়ে আছে সেখানেই যত কূটকচালি। এই দেখনা আমাদের এই হোস্টেলে কত মেয়ে, কেউ কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে? আর প্রত্যেকটি মেয়ে লাখো সমস্যা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুপারকে দেখো না দিনরাত কেমন সন্দেহের চোখে দেখেন। তার ধারণা কোন মেয়েরই সতীত্ব নেই। কিন্তু কথাটা তো ঠিক নয়। তুমি তো আছো, তুমি পবিত্র থাকবার জন্যে কিরকম লড়ে যাচ্ছ?

চকিতার মনে পড়ল গতরাত্রের কথা। মিসেস গোঙানি কিরকম মেজাজ নিয়ে অফিস ঘরে বসেছিল।

এই সময়ে দরজায় ধাক্কা পড়ল। কে?

আমি বিক্রম।

দরজা খোলা আছে। ঠেলে ঢোক্।

বিক্রম দরজা খুলে ঢুকে হেসে বলল, চকিতাদিদিমনি সুপারের ঘরে দুজন বাবু এয়েছেন, আপনাকে ডাকছেন।

চকিতা অবাক হল, দুজন বাবু! কেমন দেখতে রে!

বিক্রম হাসতে লাগল। কোন জবাব দিল না।

দূর বোকা, হাসলেই হবে। যা আমি যাচ্ছি, অপেক্ষা করতে বল্!

বিক্রম চলে গেলে চকিতা ভেবে পেল না, কারা হতে পারে! আজ সে অফিস যাবে না বলে ঠিক করেছে। অফিস গেলে নীলম খোঁজ নিতে পারে কিন্তু ইদানীং নীলমের মতিগতি দেখে বোঝা যায়, তার ওপর ইন্টারেষ্ট নীলমের কমে গেছে। তাহলে দুজন কে

হতে পারে? সুজাতার দিকে তাকাল, কে হতে পারে রে?

সুজাতা মুচকি হেসে বলল, দেখো তোমার কোন প্রেমিক।

প্রেমিক হলে তো একজন হবে দুজন কেন?

বোধ হয় কোন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে যদি তুমি কামড়ে দাও।

সুজাতার রসিকতাটা চকিতার মাথায় ঢুকল না। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল রাতের ম্যাক্সি পরে আছে? ছাড়বে কিনা ভাবল। তারপর ভাবল দরকার কি? শুধু ব্রেসিয়ারটা চাপিয়ে নিলে হবে। ম্যাক্সির গলা বড্ড বড়, সব দেখা যায়। তাই পরে নিচে এসে নামল।

দূর থেকে অফিস ঘর দেখা যায়। পিছনে ফিরে দুজন বসে আছে। কারা ঠিক বুঝতে পারল না।

মিসেস গোঙানি গম্ভীর মুখে কি যেন লেখাপড়ার কাজ করছেন। ঘরে ঢুকতেও তাকালেন না। ঐ এক মহিলার স্বভাব। সুপিরিওটি কমপ্লেক্সে ভোগেন।

পদশব্দে যে পিছন দিকে ফিরল সে সিদ্ধার্থ। চকিতাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল, এই যে চকিতা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। চকিতা বেশ কঠিন হয়ে উঠল। তা কি ব্যাপার?

না তুমি যদি প্রথম থেকে রাগ কর তাহলে কথা বলা যায় না।

তোমার সঙ্গে কথা কে বলতে চায়? বড়লোকের দুষ্টু ছেলে অন্য কোথাও ছিপ ফেলতে পার না!

এইতো রাগারাগি শুরু করলে! পাশের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, এই সুমন তোমাকে দেখতে চাইল বলে তাই এলাম।

কেন আমি বাঁদর না হনুমান যে দেখতে চাইল।

এই সময়ে পাশের লম্বাটে মুখের ছেলেটি উত্তর দিল, আপনি বাঁদর বা হনুমান হলে তো চিড়িয়াখানায় দেখতে যেতাম।

তাই যান বলে চকিতা সেই অপরিচিত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এত সরল ও পবিত্র মুখ তো খুব একটা দেখা যায় না। একটু সে নরম হল। মুখখানি সহজ করে সেই পবিত্র মুখকে

বলল, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন কেন? আমি মেয়ে বলে?

পবিত্র মুখ হেসে বলল, কতকটা। আর বাকীটা আপনার অসাধারণ চ্যালেঞ্জ শুনে।

যেমন।

আপনি বিয়ে না করে স্বাধীন জীবন যাপন করবেন। আপনি ছেলেদের একদম সহ্য করতে পারেন না।

ঠিকই শুনেছেন। চকিতা আবার কঠিন হল। তা আপনার কৌতূহলের কারণ।

কৌতূহল কি হতে পারে না? পবিত্র মুখ হেসে উঠল। যেখানে সব মেয়েরা বিয়ের জন্যে পাগল হয়, সেখানে আপনি অন্য রকম ভাবেন। এ রকম ভাবেন কেন?

হঠাৎ সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে চকিতা বলল, ঐ যে ঐ সব হামবাক দের জন্যে। এই সব মেরুদণ্ডহীন পুরুষদের দেখলেই আমার শরীর রি-রি করে। তারা আবার বলে আমি বেওয়ারিশ্।

আপনি কি সিদ্ধার্থর মতই পুরুষ দেখেছেন? আর কোন উন্নতমান পুরুষ দেখেন নি?

না।

সেটাই বোধ হয় আপনার আসল রোগ।

এবার চকিতা রেগে উঠল, আপনার কথা শেষ হয়েছে তো, এবার আমি যাব।

সুমন বলল, না আমার কথা শেষ হয় নি। আর আমি মনে করি আপনি একজন বিদুষী অভিজাত তরুণী, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাবেন না।

চকিতা বেশ অবাক হচ্ছিল, লোকটা বেশ কথার আর্ট জানে? এতকাল সেই সবাইকে দাবিয়ে এসেছে, এখন যেন সে হেরে যাচ্ছে।

পবিত্র মুখ কিন্তু চকিতার ভাবান্তর দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল, মিস চ্যাটার্জি আপনি কখনও ভাল বেসেছেন?

আপনি কি আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না?

না।

কোন তরুণীকে এসব কথা কি জিজ্ঞাসা করা শোভন ?

শোভন নয়, তবে আপনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

আমি এমন কি অপরাধ করেছি ?

কোন অপরাধই করেন নি। শুধু আপনার বৈচিত্র্য দেখে এসব কথা এসে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ মিসেস গোঙানি তুজনেই শ্রোতার ভূমিকায়। সিদ্ধার্থ বেশ মজা পেয়েছে দেখে বোঝা যাচ্ছে। মিসেস গোঙানি অবাক।

পবিত্র মুখ আবার কথা বলল, আপনি কিন্তু আমার কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

কি এড়িয়ে গেলাম ?

আপনি কখনও কাউকে ভাল বেসেছেন কিনা !

ও কথার জবাব হয় না।

সুমন হেসে উঠল, তাহলে ধরে নিলাম, আপনি কাউকে ভালবাসেন নি কিন্তু কেন ?

যদি বলি সেই ভালবাসার মানুষ তো পুরুষ, তাদের আমি খুব ঘৃণার চোখে দেখি।

কিন্তু এই বিশ্ব সংসারে নারী পুরুষের ভালবাসা নিয়েই তো জগৎ। আপনি কি করে স্বতন্ত্র হবেন ?

দেখুন সুমনবাবু অনেক কথা হয়েছে, আর নয়, আমি এবার যাব, কাজ আছে।

হা আপনার অফিস আছে, আর আটকে রাখব না। আবার এক দিন আলাপ করা যাবে।

না, আর আমার কাছে আসবেন না। আমার মনোভিপ্রায় তো শুনলেন।

শুধু লম্বাটে ধরণের মুখ নয়। চেহারাও লম্বাটে। হাত, পা বুকের ছাতি একটু অন্য ধরণের। বয়স ছাব্বিশ অথবা আটাশ। কপালের ওপর চুলগুলি ফেলা। মুখখানিতে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। সেই দৃঢ়

প্রত্যয় নিয়েই বলল, আবার আমি আসব চকিতা দেবী। আপনার কোথায় যেন একটু ভুল হচ্ছে, সেটা সংশোধন সাপেক্ষ।

কোন ভুলই আমার হচ্ছে না। আপনি আসতে পারেন। চকিতা হাত জোর করে নমস্কার করে দ্রুত ঘর ছাড়ল। দ্রুত চলতে চলতেই হঠাৎ তার মনটা কেমন অন্য রকম লাগল। লোকটার মুখটা শুধু পবিত্র নয়, বেশ বুদ্ধিমান ওর কথাবার্তা।

এমন বুদ্ধিমান লোক কি সে জীবনে দেখেছে? বরাবর সে অন্যকে দাবিয়ে এসেছে। এই লোকটা আজ তাকে হারিয়ে দিল।

ঘরে যেতে সুজাতা কি জিজ্ঞাসা করল কিন্তু চকিতা শুনতে পেলনা। মনটা তার খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আপনি কি কখনও কাউকে ভাল বেসেছেন? সত্যিই এ প্রশ্ন তো সেই নিজেকে কখনও করেনি। ভাল কাকে বাসবে? ভালবাসার লোক কি কখনও জীবনে এসেছে? এক আর্টিষ্ট অনির্বাণের ওপর একটু দুর্বলতা ছিল, এই সেদিন তার ব্যবহারে তাও গেছে।

জিনা থামও চকিতার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ বলল, এই চোকিটা তুমার অলো কি? তুমি কি ড্রিমে ভাসছো?

জুডো ক্যারাটে শেখায় একটি জাপানী দম্পতি। মেয়েদের শেখায় কিয়েতো, ছেলেদের শেখায় তিয়াসি। ওরা যে জায়গায় থাকে সেখানে একটি বড় লন আছে সেটাই কাজে লাগায়।

সিলেকটেড মেম্বার ছাড়া এখানে ভর্তি হতে পারে না। জিনা থামও এখানে তার এক বন্ধুর মারফতে এসেছিল। সপ্তাহে দুদিন এখানে শেখানো হয়। বৃহস্পতি ও রবিবার। জিনা থাম খুবই অনিয়মিত। চকিতা শিখব বলতে ওর খুব উৎসাহ লাগে। ভারতীয় মেয়ে মাত্র একজন আছে পাঞ্জাবী। সেখানে চকিতা হবে একেবারে বাঙালী।

সেদিন কিয়েতো দুঃখ করে বলছিল, খাস বেঙ্গলে একজন বেঙ্গলী লেডি শিখতে এল না।

তিনটের সময়ে যাওয়ার কথা সেইজন্যে চকিতা ছুটি নিয়েছিল কিন্তু ওর যাওয়ার কোন আগ্রহ না দেখে জিনা থাম ছটফট করে উঠল, কি হল চোকিতা যাবে না ?

চকিতার সত্যিই উৎসাহ জাগছিল না। কেন জাগছিল না সে জানেনা। সকালবেলার ঘটনাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে মনে পড়ছিল। পবিত্র মুখ ঐ ছেলেটির মত মানুষ সে কখনও দেখেনি। সত্যিই ওর কথা ঠিক, আপনাকে কেউ কখনও ভালবাসেনি না ! কি করে ও জানল ? বুদ্ধি খুব। কিন্তু ঐ বা এই সব ভেবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন ? তাকে দেখতে ভাল। পুরুষের কাছে তার মূল্য বেশী, ঐ লোকটির কাছেও কি নয় ?

এই সব আবোল তাবোল ভাবনাতেই সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। টান টান হয়ে শুয়েছিল নিজের খাটে।

জিনা থাম শুতে পাচ্ছিল না। সে একবার শুচ্ছিল, আবার উঠে বসছিল। বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে চকিতার দিকে দেখছিল।

ওর অবস্থা দেখে সুজাতা এক সময়ে হেসে উঠল। যেটুকু সংযম ছিল জিনার চলে গেল, রেগে গিয়ে বলল, ব্লাডি বাষ্টার্ড হাসছ কেন ? ব্লাডি বাষ্টার্ড যে ওর মুদ্রাদোষ এতদিনে ওর সহবোর্ডাররা তা জেনে গেছে। তাই এ নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করেনা।

জিনার রাগ দেখে চকিতাও হেসে ফেলল।

তুমি যদি না যাব বলতে আমি ফ্রেণ্ডের সঙ্গে পিকচার দেখতে যেতাম।

তা এখন যাওনা, তোমায় যেতে কে মানা করছে ?

বাহ তাকে পাব কোথায় ?

কেন ঠিকানা জানোনা ?

এ কথায় জিনা চুপ করে গেল !

চকিতা সুজাতার দিকে তাকিয়ে মজা করবার জন্য মুচকি হাসল। জিনা ফ্রেণ্ডটি কি মেল না ফিমেল ?

জিনা মজাটা বুঝল কিন্তু তবু রেগে বলল, তোমার তাতে কি ?

জিনা তুমি কাদের হেয়ার ড্রেস কর, মেল না ফিমেল !

জিনা খাট থেকে নেমে ঘুসি পাকিয়ে চকিতার দিকে এগিয়ে গেল। চকিতা তাড়াতাড়ি সরে নিজেকে বাঁচাল। ওর চোখে তখনও দুষ্টুমির হাসি। জিনা যা রেগে যায়।

জিনা আর দাঁড়াল না, চটি ফটফটিয়ে বেরিয়ে যেতে গেল। চকিতা ছুটে গিয়ে তার হাত'টা সজোরে চেপে ধরল। আচ্ছা আচ্ছা চীনা সুন্দরী রাগ করতে হবে না, চলো যাচ্ছি।

সাজগোজ করতে বেশি সময় লাগল না। সকালে ব্যায়াম করার জন্যে চকিতা একটা কষ্টিয়ুম কিনেছিল, সেটা চাপিয়ে শাড়ী পরে নিল।

জিনাও তাই করল, তবে সে তো শাড়ী পরে না, স্কার্ট ব্লাউজ চাপিয়ে নিল।

হোস্টেল থেকে বেশিদূর নয় বলে ওরা কোন গাড়ী ভাড়া করল না। হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চকিতা কাকে দেখে যেন থমকে গেল। একটা কবরখানার দেয়ালে কতকগুলি ভিখিরী শ্রেণীর লোক ঝুপড়ি করে থাকে। একটি যুবতী মেয়ে, ছেঁড়া একটা ময়লা শাড়ীতে লজ্জা নিবারণ করতে পারে নি। তার নিম্নাঙ্গ যেমন বস্ত্রহীন, অপুষ্ট বুক দুটোও উন্মুক্ত। সেই দেখে কিছু হ্যাংলা পুরুষ এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে ভিখারীও আছে, চা ওয়ালার ছেলেও এসেছে। মেয়েটি একটা ঝুপড়ির সামনে বসে জটা মাথা থেকে উকুন বেছে ফেলছে, আর ওদের দিকে আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে মিটি মিটি হাসছে। ঈশ্বর যে কি কল পৃথিবীতে পয়দা করেছেন, ঐ ঘৃণ্য মেয়ের হাসিও যেন সজীব এক প্রাণবন্ত ফুলের মত মনে হচ্ছে !

চকিতা থমকে ছিল ঐজন্যে নয়। অনির্বাণ ঐ মেয়েটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল দেখে। ঐ আর্টিস্ট যে লালসার চোখে তাকিয়েছিল না সে চকিতার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। এখুনি হয়ত ঘরে ফিরে ওকে নিয়েই স্কেচ করতে বসে যাবে।

অনির্বাণ যে আঁকার জন্যে সব করতে পারে সে দিনের সেই দৈত্যর

ঘটনায় সব বোঝা যায়। চকিতা সেদিন খুব রেগে গিয়েছিল। কিন্তু অনির্বাণ তাতে ভ্রুক্ষেপ করে নি। এঁকেছিল একজন যুবতী সুন্দরীর ওপর এক জংলী দৈত্য পাশব অত্যাচার করছে।

একরকম অভিমানেই চকিতা অনির্বাণকে মন থেকে বিদায় দিয়েছিল। আজও চলে যাবে বলে পা চালাল কিন্তু অনির্বাণ তাকে দেখতে পেল। কাছে এসে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, কেমন ছবি হবে বলত?

ছবির কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই। চকিতা যেন চেনে না এমনি ভাব করে জিনার হাত ধরে বলল, চলো জিনা।

জিনা অনির্বাণকে দেখছিল, আর চকিতাকে লক্ষ্য করছিল। ফিসফিস করে বলল, তুমার বয়ফ্রেণ্ড!

নো, নাথিং।

চকিতা চলে যাচ্ছে দেখে অনির্বাণও আটকাল না। সেই ভিখারী মেয়েটির দিকে চোখ রেখে বলল, একদিন এস না। রাম খুব তোমার কথা বলে।

চকিতা চলতে চলতে শুধু জনান্তিকে বলল, রাম খুব তোমার কথা বলে। রামের জন্যেই যেন ওনার ওখানে যাওয়া। আশ্চর্য এই মানুষ। ছবি ছাড়া পৃথিবীর কিছুই বোঝে না। ভাল ফিগার পেলে অন্য কোন চিন্তা নেই শুধু স্কেচ করতে বসে যাবে।

খুবই পিছনে পড়ে যাচ্ছিল বলে জিনা তাড়া দিল, কি হল চোকিটা তাড়াতাড়ি পা চালাও চাট্রে যে বাজে।

কিয়েতো জিনার মতই বেঁটে, তবে শরীর খুব মজবুত। তিনটি মেয়েকে জুড়ো শেখাচ্ছিল। একটি অ্যাংলো পামেলা, একটি ইংলিশ চার্লোট ও একটি পাঞ্জাবী প্রেমা।

ওপাশে তিয়াসোও শেখাছিল চারজনকে, সবই ভারতীয়। হঠাৎ একজনের দিকে চোখ পড়তে চকিতা হোচট খেল। সকালের সেই সুমন। সেও চকিতাকে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে কাছে এল না। তার পরণে ছিল একটি ছোট প্যান্ট। চওড়া কাঁধ, বিশাল ছাতি, লম্বা লম্বা হাত পা। পুরো চেহারা দেখে চকিতা প্রশংসা করল।

এরকম স্বাস্থ্য বড় একটা দেখা যায় না। ও একজনের সঙ্গে কসরৎ করছিল, সেই দিকে মন দিল।

কিয়েতোর মেয়েদের ট্রেনিং নেওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করতে হল। ওরা এসে বসল অফিস ঘরে।

দেয়ালে বুসলির নানা ভঙ্গির ছবি। তার সঙ্গে কিয়েতো ও তিয়াসোর কসরতের ছবি আছে।

একটু পরেই কিয়াতো এসে বলল, জিনা তুমি তো কসরৎ করবে যাও না! তুমি বড্ড ইরেগুলার।

তারপর চকিতার দিকে ফিরে বলল, তুমি বেঙ্গলী। অ্যাই লাইক য়ু। এসো।

কিন্তু চকিতা এত স্মার্ট ও শক্ত মনের। ঐ সুমনকে দেখার পর কেমন যেন গুটিয়ে গেছে। তারপর কাপড় খুলে কসরৎ অভ্যাস ওর সামনে সে করতে পারবে না। তাই সঙ্কুচিত হয়ে বলল, প্লিজ মিসেস হায়াসি, আজ থাক্।

কেন আজ থাকবে কেন? আমি বলছি তুমি ভাল পারবে।

না আজ থাক্।

জিনাকে নিয়ে কিয়াতো চলে গেলেন। কিয়াতোর পরণেও ছিল কষ্টিয়ুম। উজ্জ্বল সোনার রঙের সাটিংয়ের টাইট কষ্টিয়ুম। নিচে থাইয়ের ওপরে পায়ের দুই মিলনস্থানে চাপা। ওপরে গেঞ্জির মত কাঁধে দুই ফিতা। বুকের ওপর অনেকখানি নীচ পর্যন্ত কাটা বলে ভারী বুক দুটোর কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এর জন্যে কিয়েতোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রূক্ষেপ নেই আর আর শিক্ষার্থিনীরও।

চকিতা একাই সেই অফিস ঘরে অনেকক্ষণ বসে রইল। হঠাৎ আচম্বিতে সেই পবিত্র মুখের গলা শুনল। আপনি কসরৎ করতে গেলেন না কেন?

আমি তো কসরৎ করতে আসিনি।

আপনি ভর্তি হতে এসেছেন শুনেছি। আপনি কি কারাটে

শিখতে চান আত্মরক্ষার জন্যে ?

চকিতা অবাক হল ওর দূরদর্শিতায়। কিন্তু উত্তর দিল স্পষ্ট।
—হাঁ।

আমি খুব খুশি হয়েছি আপনার এই মনোভিপ্রায়ে।

চকিতা চুপ করে রইল।

বাঙালী মেয়েরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে না বলে ধর্ষিতা হয়। সুমনের কোমরে এখন আর শুধু সেই ছোট্ট প্যান্ট ছিল না, সে জায়গায় একটি চেক টাউজার ও একটি দামী বুশ সার্ট। সকালের পোষাক সে পাল্টে এসেছে। চেহারা ও পোষাক দেখে মনে হয় পয়সাওলা ঘরের ছেলে। কি পরিচয় কে জানে ?

সুমন আবার কথা বলল, এখানকার কাজ সেরে নিন। চলুন কোথাও বসে একটু আলাপটা পাকা করে নিই। সকালে তো রাগা-রাগিতে গেল। তবে সিদ্ধার্থকে দেখে রাগ হবারই কথা। ও শুধু জানে মেয়েদের একটা অর্থেই ব্যবহার করা যায়।

হঠাৎ চকিতা কথাটা না জিজ্ঞাসা করে পারল না। আপনি মেয়েদের কি মনে করেন ?

দেখুন নারী পুরুষ উভয়েই সমান। একজন ছাড়া একজন অসম্পূর্ণ।

কিন্তু অন্যে তো মনে করে নারীদের কোন মূল্য নেই।

আমি তা একেবারেই মনে করি না।

শুনে সুখী হলাম।

আপনি ব্যঙ্গ করছেন ?

না না ব্যঙ্গ করব কেন ? এরকম কথা তো শোনা অভ্যেস নেই।

জানি বলেই আপনাকে দেখার কৌতূহল হয়েছিল। পুরুষ নারীকে এক অর্থে ভাবে বলেই আপনি পুরুষদের ওপর খাপ্পা। অনেক শিক্ষিত মেয়েই খাপ্পা কিন্তু তাদের বিক্ষোভ কার্যকরী হয় না। তারা পুরুষদের ফাঁদপাতা জালে গিয়ে নিজেরা ঢোকে কিন্তু আপনি তা হতে দেন নি।

আপনার কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছে।

ঐজন্যে তো বলছি এখানকার কাজ মিটিয়ে চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসি।

কিন্তু আমার সঙ্গে একটি চীনা মেয়ে আছে।

ও জিনাকে তো আমি আগেই চিনি। এখানে মাঝে মাঝে ক্যারাটে করতে আসে। ও থাকলে কিছু অসুবিধা হবে না।

এই সময় কিয়েতো, তিয়াসি ও জিনা ঘরে ঢুকল। সুমনের সঙ্গে চকিতাকে কথা বলতে দেখে কিয়েতো বলল, ও তোমাদের সঙ্গে আগেই আলাপ আছে। তাহলে তো ভালই হল, মিঃ ব্যানার্জী ভাল শিখাতে পারবে। অনেক ভাল কসরৎ জানা হয়ে আছে।

সুমন ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, না মিসেস হায়াসি ইনি আমার কাছে শিখতে পারবেন না।

কেনো কেনো? টুমি ভালো জানে।

সি ইজ সাই ফর মি। আমার কাছে শিখতে লজ্জাবোধ করবেন।

আরি বুঝতে না পারিলাম মিঃ ব্যানার্জী।

আপনি বুঝতে পারবেন না মিসেস হায়াসি। বাঙালী মেয়েদের ভীষণ শরম। এবার যেন কিয়েতো বুঝতে পারলেন, হেসে বললেন, ওহো হো ফিমেল আর্চ।

ওরা বেরিয়ে এল বেশ কিছুক্ষণ পর।

১২

সো অ্যাণ্ড সোর রিসেপসনিষ্ট মালবিকা চলে যাবার পর জায়গাটা অনেকদিন খালি ছিল। মাঝে মাঝে একজন সিঙ্গী মহিলাকে দিয়ে কাজ চালানো হত। হঠাৎ সেদিন অফিসে ঢুকতে গিয়ে চকিতা যাকে দেখল কখনও সে তাকে আসা করে নি। সে হল অর্চনার বোন টুকুমা। টুকুমা একেবারে নিজের চেহারা পালটে ফেলেছে। শার্ট ও জিনস পরেছে। চুল কেটে হাফ করেছে। মুখখানি প্রচুর কসমেটিক

দিয়ে সাজিয়েছে। হেসে হেসে অভ্যাগতদের রিসিভ করছে। চকিতাকে দেখে ভ্রূক্ষেপই করল না। চকিতা অবাক হল ওর ব্যবহারে। যতদূর মনে পড়ে অর্চনার বিয়েতে সে টুকুমাকে কথা দিয়েছিল তাদের অফিসে সে চেষ্টা করবে কিন্তু টুকুমা তার কাছে না এসে সরাসরি একেবারে নীলম বাজপেয়ীকে পাকড়াও করেছে। মেয়েটা যে ধড়িবাজ সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

খুবই সে অপমানিত বোধ করল। তারও দেখল নীলম বাজপেয়ী তার চেয়ে টুকুমার দিকে ঝুঁকেছে খুব। অফিসে ওর নাম ইটিকা মিটার। ইতিকা ওর এক ভাল নাম ছিল, সেটা ইংরিজী চলনে ইটিকা করেছে।

চকিতা নীলমের পি, এ ছিল, আলাদা ঘর থাকলেও প্রায় সময় নীলমের ঘরে বসত। সে জায়গায় ইটিকা মিটারের ডাক পড়ে নীলমের ঘরে। ইটিকা বুক নাচিয়ে নাচিয়ে তার সামনে দিয়েই নীলমের ঘরে ঢোকে। ইটিকা দৃষ্টি হেনে বলতে চায়, চকিতা তোমার জায়গা দখল করে নিয়েছি।

টুকুর এই ব্যবহারে চকিতা খুবই মর্মপীড়া অনুভব করল। তবু সে কদিন অপেক্ষা করল, টুকু নিশ্চয় তার কাছে এসে তার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইবে। দেখো চকিতাদি, তোমাকে না বলেই আমি মিঃ বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করেছি।

মেয়েরা যে মেয়েদের শত্রু চকিতা জানে কিন্তু টুকু এতবড় শত্রুতা করবে জানা ছিল না। আর ঐ মেয়ে যে নীলমদের মত লোকদের খুশি করবে জানা কথাই। চালচলন দেখেও বোঝা যাচ্ছে হয়ত টুকু এর মধ্যে নীলমের ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে এসেছে। একদিন সাজ দেখল বুকে এক টুকরো চোলি এঁটে বার বার কাপড় ফেলে দিয়ে অভ্যাগতদের মজাচ্ছে।

চকিতার আর কোন ব্যাপারে দুঃখ হচ্ছিল না, সুমন তার প্রায় সময় কেড়ে নিচ্ছিল। লোকটার কোন পরিচয়ই সে উদ্ধার করতে পারে নি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই স্পষ্ট উত্তর ঃ থাক্ না জেনে কি

লাভ। তুমি তো আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ না যে পরিচয় দরকার।

ধর যদি বিয়ে করি? চকিতার ঠোঁটে হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা।

সেকি আমায় তোমার ভাল লেগে গেল নাকি? সর্বনাশ!

এইসব ধরণের মজার মজার কথা বলবে সুমন।

হোস্টেলে গিয়ে পাকড়াও করবে। বিক্রম এসে বলবে, দিদিমনি সেই বাবু।

সুজাতাও জেনে ফেলেছে। চকিতাদি, পুরুষবিদ্বেষ এখনও আছে?

নিশ্চয়ই। ওদের আমি কখনও পাত্তা দেব না।

সুমনবাবু পুরুষ নয়?

কেন যে ওটা পেছন পেছন ঘুরছে?

পাত্তা দিচ্ছ কেন? খুব করে অপমান করে তাড়িয়ে দাও।

অপমান তো করি। যায় না যে!

সুজাতা খিল খিল করে হেসে ওঠে। অপমান তো করি, যায় না যে। চকিতাদি তুমি প্রেমে পড়ে গেছো।

ধ্যুৎ, প্রেম না ছাই।

চকিতা বলে বটে কিন্তু নিজেই ভাবে, একেই কি বলে প্রেম? সুমন এলে অস্বস্তি হয় কিন্তু না এলে কেমন খারাপ লাগে। বার বার তার কণ্ঠস্বর কানে বাজে। নারী পুরুষ নিয়েই তো জগৎ, তুমি পুরুষবিহীন হয়ে কি করে কাটাবে?

এতদিন চকিতার মন জগতে ছিল, সে পুরুষ অবলম্বন ছাড়াই জীবন নির্বাহ করবে। কিন্তু সুমন আসতে যেন পুরুষ বিদ্বেষটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। এখন কেউ তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালে রাগ করে না, বরং মজা পায়।

ক্যারাটে শিখতে গিয়ে প্রথম প্রথম স্বল্প পোষাকে উন্মুক্ত হাত পা থাই বের করে কসরৎ করতে লজ্জা করত। ওর স্বাস্থ্য, ওর লাবণ্য দেখে অন্যেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। সুমন একদিন এগিয়ে এসে ওর লজ্জা ভেঙে দিল। বি স্মার্ট চকিতা! ডোণ্ট সাই।

আজ চকিতা অবলীলাক্রমে সুমনের সঙ্গে জুডো লড়ে। এমন এক এক প্যাঁচ মারে সুমনের লম্বা শরীরই কাৎ। একদিন দেখল সুমনের একটা হাত তার বুকে। চোখাচোখি হল। পুরুষের স্পর্শে চকিতার শরীরে এক বিদ্যুৎ খেলল। ও অন্যমনস্ক হয়ে যেতে প্যাঁচে হেরে গেল কিন্তু ওর ভেতরে এক নতুন অনুভূতির জন্ম নিল। পুরুষের স্পর্শে এত মাদকতা! সেইজন্যে নারীর কাছে পুরুষের এত দাম! ওরা হ্যাংলা হলেও ওদের প্রয়োজন নারীর কাছে এত বেশি। আমি তাহলে এতদিন ভুল পথে চলে বেরিয়েছি! ঈশ্বরের এই কলকাঠিতে কারও পরিত্রাণ নেই।

চকিতার এই মনের খবর কেউ জানল না। সুমন শুধু তার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। এবং মনে মনে অপরাধী হয়েছিল। কসরতের পর দুজনে বেরিয়ে আসতে কথাটা তুলল সুমন। চকিতা আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি নিশ্চয় ক্ষমা করবে।

চকিতা উত্তর না দিয়ে শুধু চোখে হাসি ভাঙল।

তোমার বু-কে। এই পর্যন্ত সবে শুরু করেছে সুমন, চকিতা লাফিয়ে সুমনের মুখ চেপে ধরল। খবরদার ডোণ্ট ডিসকাস। চকিতা তারপর পালিয়ে গেল সুমনকে ছেড়ে।

সেদিন হোস্টেলে ফিরেও সে সুস্থির হতে পারল না। কেমন যেন তার খুব ভাল লাগতে লাগল। অযথা সব কিছু রমণীয় হয়ে উঠল। সুজাতার সঙ্গে অজস্র কথা বলতে লাগল। হো হো হি হি করে হাসতে লাগল। জিনাকে জুডোর প্যাঁচে কবার ধরাশায়ী করল। মিসেস গোঙানির বেডরুমে গিয়ে তাঁকে জ্বালাতন করে এল। সারারাত্রি তার একরকম নির্ঘুমে কাটল। শুধু স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন।

দু তিনদিন পরে অফিসে এক মারাত্মক ঘটনা ঘটল। মনে হয় এটা নীলম বাজপেয়ীর ষড়যন্ত্র। টুকু এ অফিসে আসার পর কখনও কথা বলে নি। সামনাসামনি পড়ে গেলে শরীর ঝাপটা দিয়ে সরে গেছে। বরং চকিতারই প্রশ্ন জাগে, অর্চনা বিয়ের পর কেমন আছে

জিজ্ঞাসা করবে! ওর কোন ছেলেপুলে হয়েছে কিনা! সেদিন এমনি এক সামনাসামনি চলতে গিয়ে টুকুই বেশ জোরে ধাক্কা দিল।

দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, দেখে চলতে পারেন না। কোন মানার্স'ই জানেন না দেখছি।

চকিতারও মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, তোমার কাছে মানার্স শিখতে হবে নাকি?

নিশ্চয়ই। তুমি বলছেন কাকে?

তোমাকে।

আমায় চেনেন নাকি?

তুমি কি সেটা জানো না?

হঠাৎ টুকু চিৎকার করে উঠল, বার বার তুমি বলছেন কেন?

চিৎকারটা বেশ জোরে হয়েছিল। নীলম বাজপেয়ী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

টুকু তাকে দেখে বলল, মিঃ বাজপেয়ী এসব স্টাফ নিয়ে কাজ করেন! অচেনা একজন মহিলা আমায় তুমি বলছেন।

নীলম বাজপেয়ী টুকুকে বের দিয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

চকিতা নিজের ঘরে এসে মাথাটা টেবিলে দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। অপমানে তার ভেতর পর্যন্ত জ্বালা করতে লাগল। কি করবে সে প্রথমে ভেবে পেল না! এ যে নীলম বাজপেয়ীর ষড়যন্ত্র বেশ বোঝা যায়। এখুনি রেজিগনেশন দিয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু আবার বাড়ীতে ফিরে যেতে হবে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সূর্যান্ত বিশ্বাসের কথা। এই সেদিনও পথে দেখা হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা তাঁর অফিসে জয়েন করে। নীলম, সূর্যাস্ত একই ধাঁচের লোক। ওরা কি চায় চকিতার অজানা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব ভাবলে চলবে না। ও ফোন তুলে নিল। মিঃ বিশ্বাস, আমি চকিতা।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস যেন ফোনেই একখানা থাপ্পড় মেরে বসলেন। হাই চোকিতা কি খবর।

আমি আজ এখুনি দেখা করতে চাই।

আমার অফিস আপনার জানা আছে চলে আসুন।

ফোন রেখে দিয়ে কোন ছুটি না নিয়ে চকিতা জুতোয় শব্দ তুলে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

সূর্যাস্ত তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। যেতেই দরখাস্ত লিখতে বললো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে দিয়ে বলল, আমি জানতাম তুমি নীলমের অফিস ছাড়বে। তোমার রাইভ্যাল তো ইটিকা মিত্র। তবে সে মেয়েটির চেয়ে তুমি অনেক ব্রাইট ও সফেসটিকেট।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস গাড়ী চালিয়ে অনেকটা এসে একটা বড় বাড়ীর সামনে থামল। তারপর লিফট দিয়ে ফোর্থ ফ্লোরে এসে একটা ফ্ল্যাটের দরজা চাবি দিয়ে খুলল।

চকিতা কিছু বুঝতে না পেরে অজানা ভয়ে থমকে দাঁড়াল।

সূর্যাস্ত বুঝতে পেরে বলল, ডোণ্ট হেজিটেট চকিতা। কাম উইথ পিসফুলি।

সূর্যাস্ত ছোট্ট ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখাল। বেডরুম একটি। ডানলোপিলোর খাট। নক্সা কাটা বেডকভার দিয়ে ঢাকা। একটি সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল, একটি ষ্টিলের আলমারি। খাটের সামনে একটা রাইটিং টেবিল। পাশে ফোন। এটা পিছনের ঘর। সামনের ঘরে ড্রইংরুম। লাল রঙের সোফা সেট, বড় একটি টেবিল। পাশাপাশি খান ছয়েক চেয়ার। তারই ঠিক পাশে একটি রুম। সেখানে ড্রাইনিং টেবিল। সুদৃশ্য একটি ফ্রিজ। ফ্রিজের পাশে একটা লম্বা আলমারী। আলমারীর ঢাকনা খুলতে দেখা গেল, সব থরে থরে ফরেন লিকার। ঠিক তার পাশে কিচেন রুম, সেখানে গ্যাসওভেন, সিলিণ্ডার শোভা পাচ্ছে।

সব দেখানোর পর সূর্যাস্ত ড্রইংরুমে এসে একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন।

চকিতা তখনও হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়েছিল। সূর্যাস্ত বললেন, কি হল বসো চকিতা।

চকিতা জড়ভতের মত একটা সোফায় বসল।

এ সব কার জন্যে চিন্তা করতে পার?

না।

তোমার জন্যে। তুমি আসবে বলে এসব সাজিয়ে রেখেছি।

কিন্তু আমি! অত শক্ত মনের মেয়ে। তবু চকিতার কথা আটকে গেল।

নো নো আমার অফিসে তুমি কাজ করবে আর ঐ ন্যাষ্টি হোস্টেলে তুমি থাকবে! অ্যাই বদার।

কিন্তু!

নো নো নট কিন্তু। তুমি আজ থেকে এখানেই থাকবে। আমার সোফার তোমার সব জিনিস হোস্টেল থেকে আনতে গেছে। হঠাৎ সূর্যাস্ত উঠে এসে চকিতার পিঠে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বললেন, ডোন্ট বি হেজিটেট। বি রিলাকাস´। তুমি একজন অধ্যাপকের মেয়ে ভুলে যেও না। আমি কি তোমার সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করতে পারি!

কিন্তু আমি তো একজন আপনার সামান্য ষ্টাফ।

নো নো সামান্য নয়। তোমাকে সো করে আমি লাখ লাখ টাকা কামাব। এই ফ্লাটেই আসবে সেই সব ক্লায়েন্ট। আর ঐ যে ওয়াইনের অ্যারেজমেন্ট দেখলে ওসব ওদের জন্যে। তারপর হেসে বলল, অবশ্য তুমিও টেষ্ট করতে পার।

আমি ও সব খাই না।

ভাল, ভাল। তুমি খাও তাও চাই না। ভাল কথা, কাল তোমার কুক ও সার্ভেন্ট সকালে এসে যাবে। আজ শুধু রাতের জন্যে আমার সোফার কিছু খাবার এনে দেবে।

যা সব শুনছিল সবই যেন অবাস্তব লাগছিল চকিতার। কয়েক ঘণ্টা আগে টুকুর অপমান। সূর্যাস্তকে ফোন। অ্যাপয়েন্টজেন্ট লেটার, তারপর এই ফ্ল্যাট। চোখে মুখে জল দেবার জন্যে চকিতা বাথরুমে ঢুকল। সুইচ জেলে আলো জালাতে যেন ঘর হেসে উঠল। সাওয়াঁর বাথ, ট্যাপ কল, বেসিন, বিরাট আয়না, কমোট। তাদের বাড়ীতে এ

সব ছিল না। এ যেন রাজসিক।

মোজায়েক মেজের ওপর দাঁড়িয়ে চকিতা সুস্থির হতে পারল না। চোখে মুখে জল দেবে কি এই বিলাস, এই স্বপ্ন এ কি সে কল্পনা করে ছিল? হোস্টেলের চার সিটের ঘরে সে কোন রকমে জীবন ধারণের জন্যে থাকত। কিন্তু সেই হোস্টেল, এই ফ্ল্যাট এ যে আকাশ আর পাতাল!

সূর্যাস্ত বিশ্বাস বলল এ তার চাকরীর প্রয়োজন। ওর প্রয়োজন চকিতার জানা আছে। বড় বড় পার্টির কাছে সে দর্শন। পার্টিদের এন্টারটেন্ট করবে এই তার কাজ।

চোখ মুখে জল দিয়ে আবার ড্রইংরুমে ঢুকতেই সোফার দরজা ঠেলে তার জিনিষপত্তর নিয়ে ঢুকল। হাতে একটা ছোট্ট চিঠি। সুজাতা মল্লিকের। দিদি তুমি চলে গেলে আমার কি হবে? আমার একটা ব্যবস্থা কর, না'হলে সুইসাইড করতে হবে।

চকিতা সুজাতা মল্লিকের কথা সূর্যাস্তকে বললো। মেয়েটি সামান্য পড়াশুনা জানে। বেকার হয়ে আমার টাকায় জীবন নির্বাহ করত। ওকে একটা যে কোন চাকরী দিতে পারেন। না'হলে সে আত্মহত্যা করবে।

সূর্যাস্ত কথা দিল ঠিক আছে তোমার কথা রাখব। শোনো চকিতা প্রত্যহ আমার গাড়ী আসবে তোমায় নিয়ে যেতে। ফিরবেও গাড়ী করে। তারপর বাকী সময়ে ফ্ল্যাটে থাকবে।

কোন প্রয়োজনে কি আমি বেরতে পারব না?

না, কেন লক্ষ্য করনি, আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি।

চকিতা সত্যিই সে সব লক্ষ্য করে নি, তখন মাথার অবস্থা এমন ছিল শুধু অপমানের জ্বালা কিন্তু এখন সে আরও বিব্রত হল। এ যে স্বাধীনতা হারিয়ে একজনের দাস হয়ে গেল। একরকম বলতে গেলে ক্রীতদাসী।

সূর্যাস্ত চকিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করে হৈ চৈ স্বরে চিৎকার করে

উঠল, আরে অতো ভাবার কি আছে চকিতা? আমি তোমায় ভাল মাইনে দিচ্ছি, ভালভাবে থাকবার অধিকার দিয়েছি। সামান্য এই ত্যাগ, এটুকু স্বীকার করতে পারবে না!

চকিতার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হঠাৎ ঘটনাগুলি ঘটতে তার ক্ষুরধার বুদ্ধিও হতবুদ্ধি হয়েছিল। তাছাড়া খুব ক্লান্ত লাগছিল। বলল, মিঃ বিশ্বাস আজ এই পর্যন্ত থাক। আমি খুব টায়ার্ড ফিল করছি। কাল এ সম্বন্ধে কথা হবে।

বেশ, বেশ আমি তো তাড়াতাড়ি কিছু করতে বলি নি। সোফার খাবার নিয়ে আসছে, খেয়ে শুয়ে পড়ো। রাতের জন্যে কি কাউকে রেখে যাব?

কেন?

একা থাকতে যদি ভয় করে।

চকিতা একটু ম্লান হাসল, ভুতের ভয় আমার নেই মিঃ বিশ্বাস। আর মানুষ যদি ভয় দেখায় সে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

হা হা তুমি তো আবার জুডো ক্যারাটে শিখেছ।

আপনি জানেন আমি জুডো ক্যারাটে শিখেছি!

সূর্যাস্ত বিশ্বাস হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। আমি যাকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেব, তার সব কিছু না দেখে কি দেব?

এই সময়ে সোফার কতকগুলি প্যাকেট নিয়ে ঢুকল। সূর্যাস্ত বিশ্বাস বললেন, চলো চকিতা ড্রইংরুমে যাই, প্যাকেটগুলি সদ্ব্যবহার করে নিই।

ডাইনিংরুমে এসে সূর্যাস্ত আলমারী খুলে একটি বোতল ও গেলাস বের করল।

চকিতা তুমি ড্রিঙ্কটা সার্ভ কর। আমি খাবার গুলি সাজিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার কেউ ড্রিঙ্ক সার্ভ না করলে খেতে পারি না।

ঐ আলমারীর নিচের তলা থেকে কখানি ডিস বের করে সূর্যাস্ত দু ভাগে খাবারগুলি ভাগ করে ফেলল। সবই শুকনো খাবার। কাটলেট, ফিসফ্রাই, প্যাটিস, শুকনো মাংস, সন্দেশ, সালার্ড।

চকিতা তখনও বোতল খুলে ড্রিঙ্ক সার্ভ করে নি। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

সূর্যাস্ত তাড়া দিল, কি হল তাড়াতাড়ি নাও, রাত হয়ে যাচ্ছে।

আর চকিতা ভাবছিল, এক এক ক্ষেত্রে মেয়েরা কত অসহায়। যতই জুডো ক্যারাটে শিখুক, পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে তারা পারে না। সূর্যাস্ত বিশ্বাস যেন চাকরী দিয়ে হুকুম করতে শুরু করেছে। একজন অভিজাত শিক্ষিকা তরুণী হয়ে একজন ব্যবসাদারের হুকুমে তাকে ড্রিঙ্ক সার্ভ করতে হবে।

সূর্যাস্ত আর একবার তাড়া দিতে চকিতা আর দ্বিরুক্তি না করে বোতলের ছিপি কেটে গেলাসে পানীয় ঢেলে দিল।

সূর্যাস্ত জল মিশিয়ে পান করে ডিস টেনে নিয়ে বলল, লক্ষ্মী মেয়ে। এ রকম কথা শুনবে, দেখবে তোমার জন্যে আমি কি করি? সূর্যাস্ত আরও অনেক ভাল ভাল কথা আউরিয়ে পর পর পাঁচবার ড্রিঙ্ক করে কিছু খাবার ভেঙে মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্বরটা জড়ানো কিন্তু স্পষ্ট, বলল, চকিতা তাহলে ঐ কথা থাকল। কিছু টাকা টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, কাল সকালে কুক ও সার্ভেন্ট আসবে, ভাল ভাল বাজার করিয়ে খেও। বলে চকিতার পিছনে এসে পিঠে একটা থাপ্পড় কষিয়ে হা, হা, করে হেসে উঠল, ডোণ্ট বি হেজিটেট মাই ডালিং। তুমি তো দারুণ স্মার্ট। এমন জড়ভত হয়ে গেলে কেন? বলতে বলতে সূর্যাস্ত বিশ্বাস ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেলেন।

চকিতার ভেতর থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল খুব দ্রুত। সে বরাবর নিজেকে মনে করত খুব সাহসী ও ডানপিটে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে যে কত পঙ্গু, এই এতক্ষণ তা দেখা গেল। সূর্যাস্ত বিশ্বাস যদি ড্রিঙ্ক করে তাকে আক্রমণ করত, সে কি কিছু করতে পারত? এখন যা মনের অবস্থা, সে কিছুই পারত না। ঐ জুডোর কসরৎও সে ভুলে যেত। আর ঐ সূর্যাস্ত বিশ্বাস হা হা করে হাসতে হাসতে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করে চলে যেত।

খাবারগুলি যেমন প্যাকেট থেকে বেরিয়েছিল, সেগুলি সেখানেই

ভরে সে সেই কাঠের আলমারীর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটটা সব দেখল। দামী ফ্ল্যাট। এ ফ্ল্যাট সাজানো সূর্যাস্ত বিশ্বাসের বিজনেস ইনভেসমেণ্ট। তাকেও নিয়োগ করা হয়েছে ব্যবসার জন্যে।

বেডরুমে এসে ডানলোপিলো গদির ওপর শুয়ে তার খুব আরাম লাগল। একটা মেয়ের মূলধন তার সুন্দর চেহারা, যতই সে পড়াশুনা শিখুক চেহারা যদি সুন্দর না হত, এই বৈভব তার মিলত না। সূর্যাস্ত বিশ্বাস কি এত কদর করত, যদি না তার সুন্দর চেহারা থাকত? সে তার এই দর্শনীয় চেহারা দিয়ে বড় বড় পার্টিদের বধ করবে। সামনে সুবেশা তরুণী চটুল চোখে চেয়ে থাকলে কি প্রস্তাব নাকচ করতে পারবে! এটা সে প্রথম দেখে নীলম বাজপেয়ীর অফিসে। তখনই সে বুঝতে পারে, দুনিয়াতে সুন্দরী মেয়েদের মূল্য কত?

কিন্তু এ তো গেল ওদের সাইড। ওরা তাকে ভাঙিয়ে খাবে। তার কি হবে? সে যে স্বাধীন জীবন যাপন করবে বলে বাড়ী ছেড়েছিল? সূর্যাস্ত বিশ্বাস কি তাকে ক্রীতদাস করল না? তার চলাফেরাও নিয়ন্ত্রিত। খাটের পাশে ফোন দেখে অন্যমনস্কর মত ডায়াল করতে লাগল। ওপাশে কোথায় যেন রিং বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি ফোনটা ক্রেডেলে রেখে দিল।

১৩

পরদিন ভোরবেলা কলিংবেল বেজে উঠল। চকিতা তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছিল। বিরাট বড় আয়না, তার সমস্ত শরীরটা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। ফর্সা দুধের মত রঙের হাত, পা, বুক, মুখ, কপাল। চুলটা বেঁধে নেয় ব্যায়ামের সময়। এত বড় আয়না তাদের বাড়ীতেও আছে। যখন তার বয়ঃসন্ধি, আস্তে আস্তে শরীর পাল্টাচ্ছিল, সে দেখত সেই আয়নায়। সে

দেখতে দেখতে নিজেই বিস্মিত হত। আজও তেমনিভাবে নিজেকে দেখতে লাগল।

আবার কলিংবেল বেজে উঠল।

চকিতা ম্যাক্সিটা গায়ে চড়িয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল। তুজন বেশ জোয়ান লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তুজনই চকিতাকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করল। মেমসাহেব আমি আবতুল, আপনার রান্নার কাজ করব, আর এ ভরত আপনার খিদমত খাটবে।

চকিতা কিছু না বলে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, ওরা ভেতরে ঢুকে গেল।

রান্নার মেনু আবতুল নিজেই করল। সবই ইংলিশ খানা। ভাতের বদলে বিরানি, সালার্ড, মাংসের দোপেয়াজী। বাজার করল আবতুল নিজে। ওদের কিছুই বলে দিতে হল না। ঘর দোর ঝকঝকে পরিস্কার করল ভরত।

দশটার আগেই খানা রেডি। চকিতা সেজেগুজে টেবিলে বসল, আবতুল খানা এনে দিল। খাচ্ছে এই সময়ে সূর্যাস্ত বিশ্বাসের সোফার এল। গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। অফিসে গিয়ে সূর্যাস্ত বিশ্বাসের দেখা পেল না! তবে তার জায়গা দেখিয়ে দিল অফিস ম্যানেজার।

বিকেলবেলা পাঁচটার আগেই সেই সোফার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। চকিতা গিয়ে গাড়ীতে উঠল। এমনি ভাবে তিনদিন কেটে গেল। চারদিনের দিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেছে, দেখল আবতুল প্রচুর খানা বানাচ্ছে।

চকিতা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার আবতুল কেউ আসবে নাকি?

হাঁ মেমসাহেব বাবু ফোন করে জানালেন পাঁচজন মেহমান আসবেন। জবর খানা বানাতে।

চকিতা একটু চমকিত হল। তার কুক ও তার সার্ভেন্ট, নির্দেশ আসে সূর্যাস্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে। এ যেন তার পরাধীন দেশে বাস করা। খুবই তার হীনমন্য নিজেকে মনে হল।

এই চারদিন সূর্যাস্ত বিশ্বাসের দেখা একবারও পায় নি। অথচ

নীলম বাজপেয়ীর ওখানে কাজ করার সময়ে নীলম কখনও এমন অবহেলা করে নি। সব সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, মিস চ্যাটার্জি আর য়ূ ফিল নাইস!

খুবই হীনমন্যতায় সে তার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল। মেয়েরা অবলম্বনহীন জীবন যাপন করলে বোধ হয় এই হয়? লোকে সুযোগটা সহজে নেয়।

ফোন বেজে উঠল। চকিতা ফোন তুলল। হ্যাঁলো চকিতা, আমি সূর্যাস্ত ফোন করছি। কজন গেস্ট যাচ্ছে। তুমি একটু খোলামেলা ভাবে সেজে নিও।

খোলামেলা?

সূর্যাস্ত হাঃ হাঃ, করে হাসলেন। মানে ব্লাউজের কাট যেন একটু বড় হয়, চোলী জাতীয় সিভলেশ পরো। আর চুল ঘাড় থেকে তুলে চুড়ো করে দিও। কাপড়টা নাভির নিচে পরবে।

কিন্তু এ সব কি চাকরীর অঙ্গ?

নিশ্চয়ই। তোমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে আছে দেখো। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা, ওদের খাতির না করলে কন্ট্রাক পাবো কেন?

আমি কিন্তু এসব করতে রাজী নই?

সূর্যাস্ত বিশ্বাস ফোনের মধ্যেই হৈ হৈ করে উঠলেন, কি সব পাগলামী করছ চকিতা। এখন আর সময় নেই। মাত্র এক ঘণ্টা। জাস্ট সাতটায় ওদের নিয়ে যাচ্ছি। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, কোন অসুবিধার সৃষ্টি কোর না।

আর কিছু প্রতিবাদের ভাষা শোনার আগেই ঝকাং করে ফোন রেখে দিল সূর্যাস্ত বিশ্বাস।

চকিতা ফোনটা রেখে দিয়ে কেমন ক্লান্ত বোধ করল। সাবডিনেটকে যেমন হুকুম করা হয় সূর্যাস্ত বিশ্বাস সেই ভাবে হুকুম করল। চকিতার নিজেকে খুব চড়াতে ইচ্ছে করল, ওরে আহাম্মক মেয়ে, স্বাধীন জীবন যাপন করতে চেয়েছিলিস্ কেমন? মেয়েরা যে কোন কালেই স্বাধীনতা পায় না জানিস্ না? চকিতার ভেতরে বিদ্রোহের ইঙ্গিত জাগল।

এই ফ্ল্যাট ছেড়ে এখুনি বেরিয়ে গেলে কেমন হয়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল।

ভরত আমি একটু বেরচ্ছি।

ভরত এল না, এল আবদুল। আপনি এখন মেমসাহেব বেরচ্ছেন কেন? এখুনি যে মেহমানরা এসে পড়বেন।

মেহমান আসবেন সে বাবু বুঝবে। আমার কি?

না না মেমসাহেব আপনি এখন বেরবেন না।

মানে আমি বেরব, তুমি আমাকে আটকাবে?

আবদুল সেলাম করে জিব কেটে বলল, আপনি আমার কসুর নেবেন না মেমসাহেব। আমি সামান্য নোকর। বাবুর হুকুম আছে, আপনি ফ্লাট ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

শুনে চকিতা হতবাক হয়ে গেল। এমন একটা অনুমান সূর্যাস্তর কথায় তার হয়েছিল, এখন স্পষ্ট হল। অর্থাৎ তার হাঁটা চলা, ওঠা বসা সব সূর্যাস্তর নিয়ন্ত্রণাধীনে। দাঁতে দাঁত পিষে সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। এ যে কার খপ্পরে পড়ল? অফিস যায় সূর্যাস্তর গাড়ীতে, ফেরেও তাই। ফ্ল্যাটে আছে দুজন জোয়ান পাহারা।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। দ্রুত সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। আতরের জলে প্রাণভরে সে স্নান করল। সূর্যাস্তের নির্দেশ মতই সাজতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ খুলে গেস্টদের দেখাতে হবে। অনেক ভাল পোষাক ইতিমধ্যে এসে গেছে। ঘরে ঢুকে নানান পোষাক সে মেলে ধরল। তার চেহারা যা যে কোন পোষাকই মানান সই। স্লিভলেশ ব্লাউজ। হাত সম্পূর্ণ খোলা। মোটা মোটা পুষ্ট গোলাপী বাহু বেশ স্পষ্ট। ব্লাউজের সামনের অংশ অনেকখানি নিচের দিকে ঘের। বুকের দুই অংশের মাঝখানটা বেশ সরু খালের মত দেখাতে লাগল। ব্রেসিয়ারের বন্ধনে ছিল স্তন জোড়া। এমনিই মানানসই পুষ্ট, ব্রেসিয়ারের চাপে আরও পুষ্ট ও ভারী দেখাচ্ছে। ঈশ্বরের করুণায় চকিতার কোন অংশই বেমানান নয়। ব্লাউজটির তলার ঘেরও খুব কম। স্তন জোড়ার নিচের অংশ থেকে সব ফাঁকা।

মসৃণ ফর্সা চামড়া বেশ গোলাপী।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরখ করল চকিতা। সূর্যাস্ত বলেছে খোলামেলা সাজ করতে। অর্থাৎ তাকে দেখিয়ে বড় কনট্রাক হাতানো। নীলম বাজপেয়ীর সঙ্গে পার্টিতেও তাকে একটু খোলামেলা সাজ করে যেতে হত। কিন্তু সেখানে থাকত অনেক লোক, শুধু চোখে দেখেই কথা হত। হয়ত গেলাস হাতে পার্টির পাশে বসতে হত। পার্টি হয়ত একটু হাতের চাপাকলির মত আঙ্গুল ধরত, তার বেশি নয়।

এই নিভৃতে বন্ধ ফ্ল্যাটের মধ্যে সূর্যাস্তর ক্লায়েন্টরা কতখানি এগোবে? একটু ভয়ের শীতলতা যে চকিতার মধ্যে কাজ করল না তা নয়। তবু দেখা যাক ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করল সে। হঠাৎ কি মনে হতে ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার সব খুলে ফেলল চকিতা। একটা টেপ সেমিজ পরে নিল। বুকটা আঁটল না। অনাবৃত নিটোল বুকদুটো সেমিজের ওপর থেকে শুধু একটু উঁচু হয়ে থাকল। দু চার পা চলে দেখল, চলার তালে দুলতে লাগল বুক জোড়া। চকিতা ঠোঁটে হাসি ভাঙল। এই উন্মুক্ত শরীর দেখে পুরুষ তুমি কি করো দেখব? দ্রুত গলায় একটি লকেট দেওয়া হার পরল। রক্তমুখী পাথরটা দু-বুকের ঠিক ওপরে জেগে থাকল। চুলটা চুরো করল না, দুটো অংশ চিরে নিয়ে দু'পাশে ঘুরিয়ে পাক দিয়ে তুলে দিল।

তারপর প্রসাধন। বরাবরই সে হালকা প্রসাধন করে। একটু বেশি ক্রীম ব্যবহার করল গলা ও বুকের ওপর অংশটায়। বাহু দুটোতে মাখল বেশি করে, চক চক করতে লাগল। কিন্তু ঠোঁটে দিল আরো জোরালো লিপষ্টিক। দিতেই চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেল ওর।

এই সময়ে কলিংবেল বেজে উঠল। জুতোর শব্দ ফ্ল্যাটে ঢুকল।

মুহূর্তে সূর্যাস্ত বিশ্বাস চকিতার ঘরে ঢুকল। ঢুকে ওর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল, বাহ গুড গার্ল। এই তো আমি চেয়েছিলাম।

চকিতা কোন কথা বলল না। একটু হাসি ঠোঁটের ফাঁকে টানল।

ড্রইংরুমে তখন চারজন লোক এসে বসেছে। সকলকেই অবাঙালী মনে হল। একজন আবার পাগড়ী পরা, সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী, গালে চাপ

দাড়ি। সকলেই যে সম্ভ্রান্ত ও বড় ব্যবসাদার এ না বলে দিলেই হয়।

চকিতাকে নিয়ে সূর্যাস্ত ঢুকতেই সেই চারজন লোকের আটজোড়া চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। আবদুল ও ভরত তখন টেবিল সাজাতে শুরু করেছে। নানা বিদেশী ওয়াইনের বোতল, পলকাটা পেগ গেলাস ট্রেতে করে এসে গেল।

সূর্যাস্ত চকিতার সঙ্গে মেহমানদের আলাপ করিয়ে দিল, আমার নিউ ইনভেনসন, ভেরি বিউটিফুল অ্যাণ্ড সফেসটিকেট গার্ল, এর ফাদার একজন নামী প্রফেসর।

ওরা একসঙ্গে হুররে দিয়ে উঠল। কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে চাইল কিন্তু চকিতা তার রূপের গরবে হাত না বাড়িয়ে দিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করল।

পেগ ভর্তি করে ড্রিঙ্কস ঢালল চকিতা। তারপর অভ্যাগতদের দিকে এক এক করে এগিয়ে দিল। হাতের ছোঁয়াও দিল প্রায় প্রত্যেককে। এসব তার শেখা ছিল নীলম বাজপেয়ীর সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে। নেশা চড়তে লাগল। তার সঙ্গে খাওয়া ও কনট্রাক দুই চলল।

বারবার ফিরে ফিরে অভ্যাগতরা চকিতার দোদুল্যমান বুকের দিকে তাকাতে লাগল। ইচ্ছে করেই বেশি হাঁটাচলা করে রক্তে আগুন জ্বালালো।

কিন্তু মনে মনে তার ভীষণ ভয় করতে লাগল। পাঁচটা মাতাল যদি এক সাথে আক্রমণ করে তাহলে তার বাঁচবার আর পথ থাকবে না। কে একজন ইংরিজীতে সূর্যাস্তকে বলল, বিশ্বাস, ইউজ ফর এ নাইট।

সূর্যাস্ত হেসে কি যেন বললো। প্রায় দু-ঘন্টা পরে তারা টলায়-মান দেহে বিদায় নিল।

পরপর আরও দুদিন আরও কিছু ক্লায়েন্ট এল। চকিতাকে একই সাজে তাদের এন্টারটেন্ট করতে হল। শেষের দিন একটু অন্য-রকম হল। সেদিন এসেছিল একজন মধ্যবয়সী লোক। ঢক ঢক করে,

অনেকখানি লিকার গলাধঃকরণ করল। তার ও পেগে পোষালো না।

মোটা মোটা হাত পা। গাক গাক করে কথা বলে। চকিতার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে পাশে বসাল।

তোমার নাম চকিতা। ফাইন নেম। তুমি দেখতেও বিউটিফুল। বলে বুকের একটা স্তন তুলে দোলাতে লাগল। এ থিং ইজ ভেরি বিউটিফুল।

সূর্যাস্ত কিছু বলতে গেল।

তাকে ধমকে কাপুর বলল, ডোণ্ট টক বিশ্বাস। দিস লেডি ইজ নাউ মাইন। বেশি যদি কথা বলো, বিশ লাখ টাকার কনট্রাক ছিঁড়ে ফেলব। আমার নাম প্রেম কাপুর।

সূর্যাস্ত ভয়ে আর কথা বলল না। চকিতাই কাপুরের হাতটা সরিয়ে দিল। চকিতা উঠতে যাচ্ছিল, কাপুর থাই চেপে ধরে তাকে বসাল। কোথায় যাচ্ছ মেরে পিয়ারী? ডু য়ু ওয়াণ্ট ম্যানি! জানো রুপেয়া দিয়ে আমি কত ওম্যান কিনেছি। পকেট থেকে এক গাদা নোট বের করে চকিতার হাত টেনে তার মধ্যে গুঁজে দিল। এই নোট কেন দিলাম জানো? তোমার ভ্যালুএবেল ব্রেস্ট টার্চ করেছি।

কাপুর আর তারপর স্বঅবস্থায় থাকল না। এত মদ খেয়েছিল যে সোফার ওপরই চিৎপটান।

আবদুল ও ভরতের সাহায্যে সূর্যাস্ত তাকে নিয়ে চলে গেল।

নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা হতে হতে চকিতার আগের সেই অবস্থা আর ছিল না। তার সাহসও বেড়েছিল। মালিকের সঙ্গে তার যে চুক্তি সেই অনুযায়ী সে বেশ এগিয়ে চলেছে। মেয়েদের দাম যে কোথায় এই কদিনে সে বেশ ভালই বুঝতে পেরেছে। গত কদিনে সূর্যাস্ত বিশ্বাস কম করে সত্তর আশী লাখ টাকার কনট্রাকে সই করিয়েছে।

অফিসে প্রত্যহ যায় চকিতা কিন্তু সেখানে তার কোন কাজ থাকে না। তাই বলে যখন তখন চলেও আসতে পারে না।

সূর্যাস্তর সোফার আসে পৌনে পাঁচটায়। সে গাড়ী করে ফ্ল্যাটে

পৌঁছোয় ঠিক পাঁচটা।

একটার জন্যে তার খুবই মন পোড়ায়। সে যত্রতত্র একা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে না। সেদিন এ সম্বন্ধে সুর্যাস্ত বিশ্বাসকে বলতে গিয়েছিল, খুব ভালকথা শোনে নি।

সেদিন সকালে খাটে শুয়ে একটা ইংরিজী নভেল পড়ছে। অফিস যেতে এখন অনেক দেরী, কলিংবেল বেজে উঠল। কলিংবেল বাজলে কে এল, কি ব্যাপারে চকিতার কোন মাথা ব্যাথা থাকে না। ওসব আবদুল, ভরত সামলায়। এ ফ্ল্যাটে সব দেখাশুনা ওদের। তাই কলিংবেল শুনেও বিশেষ আমোল দিল না। এক মনে নভেলে চোখ রাখল।

আবদুল ঘরে ঢুকলো! মেমসাহেব!

বলো। চকিতা বইটা মুখ থেকে সরাল।

সাহেবের ওয়াইফ এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।

অফিসেই সুর্যাস্ত বিশ্বাসের ওয়াইফ মিনু বিশ্বাসের সম্বন্ধে তার কিছু শোনা আছে। এই অফিসের উন্নতি, তার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এক-সময় মিনু বিশ্বাস প্রাণপাত করেছে। আজ আর সে এই অফিসের জন্যে কোন মাথা ঘামায় না। আসেই না বলতে গেলে।

তাড়াকাড়ি চকিতা খাট থেকে নেমে পড়ল, আয়নার সামনে চিরুণী দিয়ে চুল ঠিক করতে গেলে হঠাৎই দরজার কাছে স্বর শুনল, অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি সাড়া পাই না কেন? আস্পর্দ্ধা তো?

চকিতা ঘুরে দাঁড়াল। চার চোখে মিল হল। মিনু বিশ্বাস আগে সুন্দরী ছিল দেখে বোঝা যায়। এখন তার কোন অবশিষ্ট নেই। চোখের কোণে এক পুরু কালি। কড়া কসমেটিকের প্রভাবে মুখের চামড়া জলে গেছে। চুল ও সামনের দিকে প্রায় নেই বলতে গেলে। বয়েসের আধিক্যে শরীরও অনেক ঢিলেঢালা।

মিনু বিশ্বাস আবার কথা বলল, ও সুর্য কেন মজেছে এবার বুঝতে পারছি। তা বাপু আমার স্বামীর খপ্পরে কেন? অন্যত্র জায়গা পেলে না?

এসব কি বলছেন আপনি? চকিতাও একটু শক্ত হল। একজন ভদ্র শিক্ষিত সফেসটিকেট তরুণীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন না?

মিনু বিশ্বাস ফণা তুলে দুপা এগিয়ে এল, চোখে আগুন জেলে বলল, তুমি মিনু বিশ্বাসকে জ্ঞান দিতে আসো এত বড় আস্পর্দ্ধা!

আপনি ভদ্র ভাষায় কথা বলবেন, তাহলে এসব জ্ঞানের প্রশ্ন আসবে না?

আমি কি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছি?

তুমি বলছেন কেন?

আমার অফিসের তুমি কর্মচারী। চাকরকে তুমি বলব না কি আপনি বলবো?

আপনাদের অফিসের কর্ম সাহায্যকারী। ভৃত্য বৃত্তি করি না যে চাকর বলবেন।

রূপ দেখিয়ে টাকা উপায় কর, আবার কথা! দেখো বাপু, আমি তোমাকে মানা করতে এসেছি তিনদিনের মধ্যে যদি আমার স্বামীর সংস্রব ত্যাগ না কর, তাহলে তোমাকে কিভাবে তাড়াতে হয় আমার জানা আছে।

এসব কথা কষ্ট করে আমাকে বলতে না এসে মি· বিশ্বাসকে বললেই তো পারতেন।

তোমার মত রাক্ষসীরা ঘাড়ে চাপলে তাদের কি ফেরানো যায়!

আমি তাঁর ঘাড়ে চাপি নি, তিনিই বরং আমাকে বন্দী করে রেখেছেন।

ঐ হল। যাই হোক, আমি ওসব তত্ত্বকথা শুনতে আসি নি। আমার ডিসিশন শুনলে তো! দি ইজ ফাইনাল। আবদুল!

আবদুল দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, জী?

এই মেমসাহেব এই ফ্ল্যাট ছেড়ে তিনদিনের মধ্যে চলে যাবে। চলে গেলে চাবি আমার হাতে দিয়ে দেবে।

মিনু বিশ্বাস পা দাপিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেল।

আবদুল দরজা বন্ধ করে এসে বলল, আপনি কিছু ভাববেন না মেমসাহেব। সাহেবের ওয়াইফের মাথায় একটু গোলমাল আছে।

কিন্তু চকিতার এসব কথা কানে ঢুকল না। সে খুবই অপমানিত বোধ করল। যেদিন থেকে সে সূর্যাস্ত বিশ্বাসের অধীনে এসেছে সেদিন থেকে সে নিজেকে ছোট মনে করছে। তার প্রখর ব্যক্তিসত্ত্বা যেন কোথায় জলাঞ্জলি গেছে। তার সাহস, অধ্যবসায়, সত্ত্বা সব হারিয়ে গেছে। সে যেন চলমান এক পুতুলে পরিণত হয়েছে। তবে কি নারীর কোন স্বাধীনতাই এ জগতে নেই? মিনু বিশ্বাস এসে তো সেই নারীত্বের ওপরই কালিমা লেপে গেল।

কতক্ষণ ভেবেছে জানে না। আবদুল এসে জানাল, মেমসাহেব অফিসের সময় হয়ে গেছে।

ও একরকম ঘোরের মধ্যেই সব কাজ শেষ করল। যথারীতি সোফার এলে নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। অফিসে নিজের ঘরে সবে ঢুকেছে, সূর্যাস্ত বিশ্বাস এসে দাঁড়াল!

চকিতা আাই অ্যাম সো সরি ফর মাই ওয়াইফ। তুমি কিছু মনে না। মিনুর মাথায় একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে।

এই লোকটাই তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। এই লোকটাই তাকে নিয়ে পুতুলের মত খেলছে। এই লোকটার জন্যে তার একক জীবন যেতে বসেছে।

খুব রেগেই চকিতা বলল, দেখুন মি, বিশ্বাস, ইটস্ নট এ কনসোলেশন টু মি। আাই রিজাইন য়োর সার্ভিস। অ্যাই অ্যাম ভেরি মার্চ ইনসালটেড মাইসেলফ।

সূর্যাস্ত বিশ্বাসও কমজোরি লোক নয়, হা হা করে হেসে বলল, বিশ্বাস এন্টার প্রাইসে ঢোকা সহজ, বেরোনো সহজ নয় বুঝলে। তারপর স্বর পালটে বলল, ওসব মতলব ছেড়ে দাও। আজ এটি সিক্স রেডি থাকবে আমি পাটি নিয়ে যাব।

আপনার হুকুম!

ইয়েস।

চকিতা ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার আগেই সূর্যাস্ত বিশ্বাস সরে গেলেন।

কিন্তু যথারীতি ছটার সময়ে চকিতা সাজবে না বলেই ঠিক ছিল, কি ভেবে সাজল। পালানোর মতলবই ঠিক। তবে বুঝতে দিতে সে চায় না। কিন্তু ছটা বেজে গেল সূর্যাস্ত বিশ্বাস এল না। ফোন এল আরও আধঘণ্টা পর। চকিতা ফোন ধরল।

শোনো চকিতা, পার্টি আজ কোন কারণে যেতে পারল না। টুমোরো কাম।

আগামী কাল রবিবার। চকিতা গত থার্সডে জুডো ক্লাবে যেতে পারে নি। এ রবিবার যাবে বলে ঠিক ছিল। সুমনের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি, দেখা হবে। তাই বলল, টু মোরো আমি একটু বেরোব। আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করবেন।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস যেন কথাটা বিশ্বাস করল না, কি বললে বেরবে? আমার বিনা হুকুমে তুমি বেরোও কেমন করে?

কেন আমি কি আপনার চব্বিশ ঘণ্টার সেবাদাসী নাকি?

অফকোর্স।

এটা ভুলে যাবেন না আমি একজন শিক্ষিত মহিলা।

তুমিও ভুলো না, তুমি একজন সুন্দরী যুবতী নারী। তোমায় ইউটিলাইস করব বলে আমার কোম্পানীতে চাকরী দিয়েছি। তোমার মত বহু মেয়ে আমার কোম্পানীর উন্নতির জন্যে সার্ভিস দিয়েছে। কেন আমার ওয়াইফ মিনু বিশ্বাসকে দেখ নি! তাকেও আমি ইউটিলাইস করেছি।

দাঁতে দাঁত চিপে চকিতা বলল, ব্রুট।

সে কথার উত্তর না দিয়ে সূর্যাস্ত বলল, ওসব পাগলামী ছেড়ে দাও। আমি যা বলছি শোনো, কাল এই ছটাতে রেডি থাকবে।

ঝকাং করে শব্দ তুলে সূর্যাস্ত বিশ্বাস রিসিভার রেখে দিল।

সারারাত ধরে চকিতা চোখের জলে ভাসল। কখনও সে কাঁদে নি। তার মত দৃঢ়চিত্ত মেয়ের এ কি অধোগতি! বাবা তাহলে ঠিকই বলেছিলেন, বাড়ীর বাইরে যখন হচ্ছ আর ফিরে আসার চিন্তা করবে না। অভিভাবকের আওতা থেকে বেরিয়ে এলেই মেয়েদের যে অনেক বিপদ ঘনিয়ে আসে, আজ পদে পদে সে বুঝতে পারছে। পৃথিবীর সমস্ত থাবা যেন একটি যুবতী মেয়েকে গ্রাস করবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু সে এতো বুদ্ধিমতী হয়েও কিভাবে সুর্যাস্ত বিশ্বাসের খপ্পরে পড়ে গেল।

ফ্ল্যাটে দুজন জোয়ান যমদূত পাহারা দিচ্ছে। কোন অবস্থাতেই এখান থেকে বেরোনা অসম্ভব। ফোন করে বাড়ীতে জানাতে পারে কিন্তু কেউ আসবে না। বাবা, দাদা দুজনেই জেনে গেছে সে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যে নষ্ট হইনি এ কথা কি ওরা বিশ্বাস করবে? সুর্যাস্ত বিশ্বাস এটুকু অনুগ্রহ এখনও করেছে। কে জানে কেন এই অনুগ্রহ সে জানে না। তবে যদি কোনদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কি জুডো দিয়ে বা তার সেই ছুরি দিয়েও আটকাতে পারবে? ফ্ল্যাটে আছে জোয়ান আরও দুজন তারা মালিককে সাহায্য করবে না? এই সব ভেবেই চকিতা আরও দিশেহারা হয়ে গেল। কি ভয়ঙ্কর বিবরে সে ঢুকে পড়েছে।

সারারাত সত্যিই তার ঘুম হল না। সকালবেলা ব্যায়াম করতেও উঠল না। অবসাদে শুয়ে থাকল খাটের ওপর। চোখ দুটো নির্ঘুম অবস্থায় কড় কড় করছে।

আবদুল এসে ডাকল, মেমসাহেব উঠবেন না! নাস্তা লাগিয়ে দিয়েছি।

যেন হুকুম। অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল, এ কী চেহারা হয়েছে তার? এত

সুন্দর প্রাণবন্ত মুখখানি কে যেন এক ভাঁড় কালি ঢেলে দিয়েছে। তার ওপর চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল। মনের যন্ত্রণা যে বাইরে প্রকাশ পায় এই চেহারা দেখে বোঝা যায়।

টেবিলে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে আবদুলই বলল, মেমসাহেব আপনার কি তবিয়ৎ খারাপ।

হ্যাঁ।

খানা বানাবো না!

বলতে ইচ্ছে হল, বানিও না। কিন্তু তা না বলে বলল, এমন কিছু না, বানাও।

আজ তো ছুটি, শুয়ে আরাম করুন। মালিক তো ছটায় পার্টি নিয়ে আসবেন তখন উঠবেন।

সূর্যাস্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে সব খবরই আবদুলের কাছে চলে আসে। ভরতের চেয়ে আবদুলই ধড়িবাজ বেশী। সেই জন্যে তাকেই খবরদারীটা দেওয়া হয়।

আবদুল সরে গেলে চকিতা ধীরে ধীরে ব্রেকফাস্ট খেতে লাগল। সে মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল, একবার গিয়ে ফ্ল্যাটের বেরনোর ছিটকিনি যদি সে খুলতে পারে, তাহলে আর আবদুল তাকে রাখতে পারবে না। যদি রোখে তার জুডো তো জানা আছে। দুটো হাত কি পা সে চালিয়ে ঐ জোয়ানকে ফেলে দিতে পারবে না।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজনা জেগে উঠল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা সাধারণ শাড়ী পরণে। জিনিসপত্তর যা আছে পড়ে থাক্। শুধু টাকার ব্যাগটা নিলে হবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝটিতি উঠে ঘরে গেল। ব্যাগটা বুকের খাঁজে চালান করে দিয়ে বাইরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

সবে ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে আবদুল দূর থেকে বলল, কেউ ডাকছে মেমসাহেব?

ছিটকিনিতে আর হাত দেওয়া হল না চকিতার। হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল, মনে হল যেন কেউ?

কই কলিংবেল তো বাজেনি ! আমি তো রসুই ঘরে আছি।

দরজায় যেন কেউ ধাক্কা দিল। চকিতা কি বলবে ভেবে না পেয়ে নিরুৎসাহ হল।

দেখছি আমি। আপনি ঘরে যান, আরাম করুন।

আবদুল এগিয়ে এসে দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

আর চকিতা নিজের ঘরে এসে নিষ্ফল রাগে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। এই বন্দীদশা থেকে কিছুতে তার মুক্তি নেই। সে শেষ হয়ে গেল। সূর্যাস্ত বিশ্বাসের খপ্পরে সে পড়ে গেছে। তার একক জীবনের এইখানে সমাপ্তি। এর পর একটি নষ্ট মেয়ে হয়ে তাকে বাকী জীবন বেঁচে থাকতে হবে। বড় তার স্বাধীনতাকামী উন্নত মন ছিল, কি বড় বড় কথা এক সময় বলেছে। কিন্তু কখনও তো এমনি যাতাকলে পড়বে ভাবে নি। লোকে সুযোগ বুঝে সম্মানহানি করে এই জানা ছিল। পরমেশ্বর তাকে ছল করে ধরে নিয়ে আক্রমণ করেছিল কিন্তু এমন চক্রান্ত ! ঐ জন্যে মেয়েদের বড় হলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে একজনের আশ্রয়ে নিরাপত্তার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে এই একজনের অবলম্বন চাইবে না বলেই একক হতে চেয়েছিল। আর ঐ হ্যাংলা পুরুষরা তার দু চোখের বালাই। তারা মেয়েদের শরীর ছাড়া কিছু জানে না বলে রাগ। বাপকেও সে দারুণ অপমান করে চলে এসেছে।

হঠাৎ বেলা এগারটার সময়ে ফোন বেজে উঠল। প্রায় সময় চকিতার ঘরে এসে আবদুলই ফোন ধরে। আবার কোন কোন সময়ে চকিতা ধরে। ফোন বেজে যেতে তাই প্রথমে চকিতা ধরল না কিন্তু আবদুল এল না দেখে সে খাটের কোণে সরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিল। হ্যালো।

কে চকিতা ?

বলছি, আপনি কে ?

বাব্বা খুব জোর পেয়ে গেছি। আমি সুমন ব্যানার্জি।

চকিতা লক্ষ্য করল তার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। সে স্থান–

কাল ভুলে বেশ জোরেই বলে উঠল, সুমন তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে এরা বন্দী করে রেখেছে।

আস্তে বলো। সেই কুকটা শুনতে পারবে যে।

চকিতা দরজার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, তুমি সবই জানো?

জানি। তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে কদিন ধরে চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু কিছুতে সুযোগ পাচ্ছি না। কিন্তু এখন আমার সব চেয়ে বড় প্রশ্ন. তুমি তোমার একা থাকার বাসনা ত্যাগ করেছ তো!

চকিতা যেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। যেখানে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সেই আশায় সুমন চ্যাটার্জি এগিয়ে এসেছে। আর সুমনকে সে এই শেষ দিকে একটু পছন্দ করছিল। লোকটি দারুণ স্পষ্ট বক্তা। ও অসহায়ের মত করুণ স্বরে বলল, সুমন ওসব কথা এখন আসছে কেন?

আসছে এই জন্যে যে তুমি তো স্বাধীন নারীপ্রগতি পছন্দ কর। পুরুষের সাহায্য ছাড়াই জীবন কাটাবে।

বেশ বাবা ভুল বলেছি। আমি আমার কথা উইথড্র করছি।

মিঃ বিশ্বাস কখন আসবেন!

ছটায়।

দেখি।

কিন্তু তখন কি দরকার? এখন তো মাত্র ঐ কুক ও সার্ভেন্ট আছে।

না মিঃ বিশ্বাসকেই দরকার। তাকে জানিয়ে দিতে চাই তুমি বেওয়ারিশ অ্যানক্লেমড নও। হঠাৎ ফোনটা ছেড়ে গেল।

চকিতা উত্তেজনায় হ্যালো হ্যালো বললো কিন্তু কোন সাড়া এল না। সাড়া না এলেও ওর খুব ভাল লাগল, তার মুক্তির জন্যে কেউ চেষ্টা করছে ভেবে। দিশেহারা যে ভাবটা ছিল, তার অনেকটাই অপসারিত হল। সুমন ব্যানার্জির সঙ্গে যতদিন আলাপ হয়েছে, ওর কড়া কড়া কথা শুনেও তাকে ভাল লেগেছে। ঐ বলেছিল, কেউ

আপনাকে কখনও ভালবাসে নি, না! ঐ জন্যে আপনার মন এমনি হয়েছে।

যেখানে পুরুষদের হ্যাংলা ছাড়া কিছু মনে হয় নি, একদিন সুমনের হাত বুকে লাগতেও তাকে খারাপ মনে হয় নি, বরং শরীরের মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আজ তার মুক্তির জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারাদিনটা কেমন করে যেন ভীষণ ভীষণ ভাল লেগে যেতে লাগল। পাঁচটার সময়ে আবদুল এসে জানাল, মেমসাহেব রেডি হয়ে নিন। সাহেব ছটায় আসবেন।

অন্যদিন আবদুলের কথায় চকিতার রাগ হত, আজ সে তার উত্তরে বলল, ঠিক আছে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আবদুল।

আবদুল একটু বিস্মিত হল, মেমসাহেবের এ স্বর তার চেনা নয়, তাই সে খুশি হয়ে মৃদু হাসল।

সুমন যে সূর্যাস্ত বিশ্বাস এলেই আসবে তার জানা হয়ে গেছে। একটা ঘটনা যে ঘটবে এই আনন্দে দ্রুত সেজে নিল চকিতা। আজ সে সেই টেপ সেমিজই পরল। বুকের তলায় কোন বন্ধন দিল না। বুক দুটো চলার ছন্দে দুলতে লাগল।

ঠিক ছটার সময়ে কলিংবেল বেজে উঠল। সূর্যাস্ত বিশ্বাস ঘরে এসে ঢুকল। আজ তার পরণে সাহেবী পোষাক নয়। পাঞ্জাবী পাজামা। সঙ্গে কেউ ছিল না। আবদুল টেবিলে খানা লাগাতে গেল।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস চকিতার বেডরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আমাদের দু-জনের জন্যে এ ঘরে নিয়ে এস। সঙ্গে ওয়াইন

চকিতা রুমের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সূর্যাস্ত বিশ্বাস তার হাত ধরে ঘরের দিকে ফিরিয়ে বলল, পার্টিরা আজ এল না। এসো তোমার বেডরুমে আজ বসি। বলে চকিতার হাত ধরে খাটে বসিয়ে নিজে পা তুলে পাশে ঘন হয়ে বসল।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস যে একটু ড্রাঙ্ক হয়ে আছে দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

আবদুল ছোট টেবিল লাগিয়ে গেল। তারপর বোতল, গেলাস, জল, একটা ডিসে করে চিকেন রোস্ট রেখে গেল।

সূর্যাস্ত বলল, দুটো গেলাসে সার্ভ কর চকিতা। আজ তুমিও একটু খাবে।

চকিতা কোন কথা না বলে একটা গেলাস তৈরী করল।

সূর্যাস্ত সেই দেখে বলল, তোমারটা নিলে না!

না।

কেন?

এটাও কি আমার চাকরীর কনট্রাক?

ইয়েস। য়ু আর এ হোল্ডটাইম সার্ভিস হোলড্রেস ইন বিশ্বাস এণ্টার প্রাইজেস।

খানা পিনা নিশ্চয় পার্সোনাল উইল।

ও সব বক বক মাৎ করো। সূর্যাস্ত গর্জে উঠল: অ্যাই অর্ডার য়ু মাস্ট ওবে।

চকিতা আর কোন কথা বললো না। সূর্যাস্ত ঘন হয়ে বসেছিল চকিতার পাশে।

চকিতার শরীরটা বের দিয়ে ধরতে গেল, সে সরে বসল।

সূর্যাস্ত বলল, সরে বসছ কেন? আজ আমি তোমাকে চাই বুঝতে পারছ না!

অ্যাই অ্যাম নট এ চিফ ওম্যান।

অফর্কোস য়ু চিফ। আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি।

সেটা আপনার বিজনেসের খাতিরে।

সূর্যাস্ত হঠাৎ নিজের স্বভাবে হা হা করে হেসে উঠল। এটাও তো বিজনেস। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে খুশি করা কি তোমার কর্তব্য নয়? হঠাৎ সূর্যাস্ত বোতল তুলে ঢক ঢক করে কিছু পাণীয় গলাধঃকরণ করল। ভেতরে চলে যাবার পর উত্তেজনা জেগে উঠল।

চকিতা এই দেখে প্রবলভাবে সাহস সঞ্চয় করছিল। তার আরও

সাহস জাগিয়েছিল সুমন ব্যানার্জি। হয়ত সে এখুনি এসে পড়বে।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস হঠাৎ চকিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মুখের ওপর মুখ রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। অ্যানক্লেমড বেওয়ারিশ ওম্যান, সূর্যাস্ত বিশ্বাসের খুশির ওপর ছুরি চালাও!

সূর্যাস্ত বিশ্বাসের ভারী শরীরের দাপটে চকিতা বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছিল। সূর্যাস্ত বিশ্বাসের একটা হাত চকিতার একটা বুকে। কোন বাধা দিও না সুন্দরী। প্রাণ ভরে আমায় ভোগ দিয়ে তোমার মাধুর্য গ্রহণ করতে দাও।

চকিতা নিজের শক্তি দিয়ে শরীর তুলে খাট থেকে নেমে এল। সে তখন বেশ হাঁপাচ্ছে।

সূর্যাস্ত তুমি চকিতাকে চেনো না। টেপ সেদিন্ড সে শরীর থেকে নামিয়ে দিল। শরীরে টাইট কস্টিয়ুম।

সূর্যাস্ত বিশ্বাস একটু থমকাল। কিন্তু চকিতার নিটোল শরীরের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল। কেন এমন বেয়াড়াগিরি করছ সোনামণি। সূর্যাস্ত এগিয়ে এল, আসার সঙ্গে সঙ্গে চকিতা তার ক্যারাটের প্যাঁচ ছাড়তে লাগল। কটা লাথি ঘুসো চালিয়ে দিল সূর্যাস্তর ওপর। ড্রাঙ্কারের পেটে একটা লাথি লাগতে সে ওফ্ বলে বসে পড়ল।

কিন্তু সে সামান্য মুহূর্ত। সূর্যাস্ত ভীম বেগে চকিতার দিকে এগিয়ে এল। চকিতা এলোপাথারি কসরৎ চালিয়েও সূর্যাস্তর সঙ্গে পারল না। সূর্যাস্ত তাকে পাঁজাকোলা করে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল, তার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরল শরীর দিয়ে।

আবদুল, ভরত দূর থেকে এই কাণ্ড দেখছিল। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। আবদুল কিছু না ভেবে দরজা ফাঁক করতেই এক ঘুষি তার মুখের ওপর পড়ল। দরজা খুলে গেল।

সুমন ঢুকে লাথি, ঘুসো চালিয়ে আবদুলকে ধরাশায়ী করল। ভরত পালাচ্ছিল, ভরতকে ধরেও লাথি, ঘুসো। সে ও 'গিয়ারে' বলে লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে তখন চকিতার সঙ্গে সূর্যাস্তর ধস্তাধস্তি চলছে। চকিতার সারা মুখে সূর্যাস্তর লালা। বোধ হয় কটা দাঁতও বসিয়ে দিয়েছে গালে।

চকিতা বাইরে সাড়া পেয়ে চিৎকার করে উঠল, সুমন আমায় তুমি বাঁচাও।

সুমন ঢুকেই সূর্যাস্তকে জামা ধরে চকিতার বুক থেকে তুলল। মুখে এলোপাথারি কটা ঘুসি চালিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, আমার লেডির ওপর তুমি হাত লাগাও, জানোয়ার বদমাইস, উল্লুক, লম্পট। ভাবো টাকা দিয়ে সব কেনা যায়!

সূর্যাস্ত নিজেকে রক্ষা করবার আগে এলোপাথারি লাথি, ঘুসো চালাতে লাগল সুমন।

সূর্যাস্তর মুখ ফেটে গেল, চোখ আলু হল। তারপর নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

চকিতা ছুটে এসে সুমনকে জড়িয়ে ধরে জোরে কেঁদে উঠল, সুমন তুমি না এলে আজ আমার কি হত?

এ কথা কি কখনও ভেবেছিলে?

না, না সুমন। চকিতা সুমনের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

আর এখন সময় নেই, তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছাড়তে হবে। তোমার কি নেবার আছে?

চকিতা তার সুটকেসটা দেখিয়ে দিল। সুমন সুটকেসটা হাতে তুলে নিল। চকিতা সেই কষ্টিয়ুমের ওপর একটা ম্যাক্সি জড়িয়ে বেরিয়ে এল। ফ্লাট থেকে বেরিয়ে সুমন লকটা টেনে দিল। ব্যাটারা কয়েক ঘণ্টা বন্দী থাক্। ফোন করে লোক আনতে আনতে আমরা অনেক দূরে।

নিচে দেখা গেল দুখানি গাড়ী। একটি গাড়ীর দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, চিনতে পার? যে গাড়ী করে রোজ অফিস যেতে।

চকিতা কোন কথা বলল না। সে সুমনের হাত ধরেই এগোচ্ছিল।

পরে আর একখানি গাড়ী ছিল, দরজা চাবি দিয়ে খুলে সুমন বলল, ঢোকো।

কোন প্রশ্ন না করে চকিতা ঢুকে গেল।

সুমন দরজা বন্ধ করে গাড়ী চালিয়ে দিল। উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটে বললো। কারুর মুখে কোন কথা নেই। চকিতা ভীষণ শ্রান্ত হয়ে সীটের ওপর মাথা দিয়ে চোখ বুজেছিল। একটা ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বাঁচার পর সে যেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। হঠাৎ গাড়ী থামতে সে চোখ খুলল।

কি হল সুমন থামলে কেন?

তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

চকিতা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। গাড়ীর মধ্যে একটি জোরালো আলো জ্বালা হয়েছিল।

তুমি তো একজন শিক্ষিত মহিলা। তাছাড়া তোমার মতামত একটু ভিন্ন ধরণের। এখন তুমি কোথায় যেতে চাও বলো।

চকিতা কথা না বলে চোখ বুজল।

কি হল বলো?

চকিতা খুব চাপা স্বরে বলল, জানি না।

জানিনা বলোনা, তুমি যেখানে বলবে পোঁছে দেব।

বললাম তো জানি না। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

তুমি তো পুরুষদের হ্যাংলা বলো। আমিও তো পুরুষ, হ্যাংলাও।

চকিতা সুমনের পাশে ঘন হয়ে বসে তার মুখে হাত চাপা দিল।

মুখ সরিয়ে নিয়ে কিছু বলতে গেল সুমন, চকিতা আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, আর কিছু বলো না। আমার ভুল ভেঙে গেছে।

কি?

একজনের ওপর নির্ভর করাই উচিত।

আজ এই দেখে বুঝি শিক্ষা হল।

চকিতা মাথা নাড়ল।

তুমি তার দেখা পেয়েছ ?

চকিতা সুমনের দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

কে সে ?

এবার চকিতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, জানি না।

সুমন কপট অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, বলবে তো তার কাছে আমি পৌঁছে দেব।

চকিতা খুশির চোখে কথা ঘোরানোর জন্যে বলল, তুমি কি এই রাত্রে গাড়ীতে বসেই রাত কাটিয়ে দেবে ?

বাহ কোথায় যাব সেটা তো বলবে।

আমি তার কি জানি ?

তবে কে জানবে ?

চকিতার এরকম মজার আলোচনায় কখনও যোগদান করেনি। ওর ভাল লাগছিল। ঠোঁট কামড়ে হেসে বলল, তুমি।

আমি ? সুমন আবার মজা করল। তাহলে এক কাজ করি জীবনলাল চ্যাটার্জির বাড়ীতে পৌঁছে দিই।

চকিতা আতঙ্কে বলল, তাঁকে চেনো নাকি ?

সুমন বলল, কেন চেনায় দোষ আছে নাকি ?

চকিতা একটু নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, না দোষ আর কি ?

সুমন ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, চকিতা !

চকিতা চোখ তুলল।

তোমাকে কখনও কেউ ভালবাসেনি, না !

চকিতা চুপ করে রইল।

কেউ ভালবাসলে আর এমন করে ঘর ছাড়তে না, না !

চকিতা যেন নিজেকে সুমনের কাছে নিঃশেষে সপে দিয়েছে, এমনি-ভাবে তার গা ঘেষে চুপ করে বসে রইল। সুমন আর কিছু বললো না, চকিতাকে হাতের বেড়ে কাছে টেনে নিল।

এবার তোমায় কিছু পিছনের ঘটনা বলি শোনো। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, তুমি আমার ছোটবেলার খেলার সাথী ছিলে !

চকিতা সুমনের বুকের পাশ থেকে তার মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের বাগানে রোজ একটি গোলাপ ফুটত। একটি ফুটলে তোমার। দুটি ফুটলে দুজনের কিন্তু বরাবর একটি ফুটত, আর ঐ নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত।

আমি ঝগড়াটাই চাইতাম, কারণ তোমার ঝগড়া করা আমার ভাল লাগত। এটা ছিল আমাদের ছোটবেলার ঘটনা। তারপর তোমাদের সঙ্গে আর আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

বাবাও অধ্যাপক, তোমার বাবাও। যোগাযোগ উভয়ের ছিল কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল না। একদিন তোমার বাবা আমার বাবাকে তোমার সম্বন্ধে খুব দুঃখ করছিলেন। আজকাল মেয়েদের এডুকেশন দেওয়া উচিত নয়। তারা ভাল শিক্ষা পায় না তো, কুশিক্ষা পায়। আরে বাবা, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস বিয়ে থা করতে হবে না। না স্বাধীন-ভাবে থাকব, কারও অধীন হব না। এই যে চিন্তা কত বিষময় বলুন তো! মেয়েরা একক জীবনে থাকতে চাইলে এই সমাজ কি তা স্বীকার করে! ছিঁড়ে খুঁড়ে নোংরা করে দেয় না? কিন্তু চকিতা শুনল না, কোথায় এক চাকরী যোগাড় করে হোস্টেলে গিয়ে উঠল।

এইটুকু আমার কানে আসে। তখন আমার সে ছোটবেলাকার গোলাপ ফুলের কথা মনে পড়ে। সেই চকিতা আজ বড় হয়ে গোলাপ ফুল খুঁজতে বেরিয়েছে। হোস্টেলের ঠিকানা যোগাড় করে একদিন তোমাকে দেখি। দেখে চোখ ফেরাতে পারি না। ছোটবেলাতেও তুমি সুন্দর ছিলে, বড় বেলায় যেন আরও সুন্দর।

এই সময়ে চকিতা সুমনের বাহুতে চিমটি কাটল।

সুমন হেসে উঠল, শোনো না তারপর আমার অ্যাডভেঞ্চারটা। একদিন দেখি তোমার অফিসের সামনে সিদ্ধার্থ তোমাকে গাড়ীতে তুলছে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তার কাছে জানলাম, তোমার মনোভিপ্রায়। তুমি পুরুষদের দুচোখে দেখতে পার না। তাদের হ্যাংলা বলো, ঘৃণা কর। তোমার মত মেয়ের যে এ কথা বলা সাজে মানলাম কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পৌরষেও ঘা লাগল,

আমিও তো পুরুষ, আমাকেও তাহলে তুমি ঘৃণা করবে। কিন্তু কেন এই ঘৃণা ভাবতে ভাবতে খেয়াল হল, চকিতা বোধ হয় কোনদিন কোন ভাল পুরুষের দেখা পায় নি।

চকিতা আবার চিমটি কাটল। আহা নিজে যেন জ্যোতিষী এলেন।

সুমন বলল, জ্যোতিষী কিনা জানিনা, তবে আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় সেটা পরে দেখেছি। কিন্তু আমার ভাবনা হল, একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে একা চলতে গেলে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

জিনা থানকে তোমার মনে আছে চকিতা?

ব্লাডি বাষ্টার্ড।

হাঁ ও সেল্টার খুঁজছিল। ওকে ঐ হোষ্টেলে তোমার পাশের সীট যোগাড় করে দিই। ঐ তোমায় কায়দা করে ক্যারাটে ক্লাবে নিয়ে যায়। তুমি কিছু কসরৎ শিখলে অন্তত নিজের সাময়িক বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে।

এইসময় চকিতা কথা বলল, ক্যারাটে না শিখলেও আমার কাছে সব সময়ে একটি বিদেশী ছুরি থাকত।

সেটা আমি পরে শ্যামলদার কাছ থেকে শুনেছি। তার এক কে বন্ধু পরমেশ্বর তোমায় ঘায়েল করতে গিয়েছিল। আমি হয়ত তোমার সামনে সহজে যেতাম না কিন্তু ঐ সিদ্ধার্থর কাণ্ডকারখানা দেখে একদিন তোমার হোষ্টেলে গিয়ে পরিচিত হই, সিদ্ধার্থকে সাবধান করে দিই, চকিতা আমার পরিচিতা, ওর দিকে হাত বাড়াবে না! তারপরের ঘটনা অবশ্য সব তোমার জানা।

এবার সূর্যাস্ত বিশ্বাসের ঘটনা বলি। সোফার তোমার জিনিষপত্তর নিয়ে গেলে জিনা আমাকে খবর দেয়। তোমার পাত্তা লাগাতেও আমার তিনদিন কেটে যায়। তোমার ফ্ল্যাট খুঁজতে আরও একদিন। দেখি তুমি সূর্যাস্ত বিশ্বাসের গাড়ী করে অফিস যাও, ফেরোও গাড়ী করে।

একদিন ফ্ল্যাটবাড়ী সামনে দাঁড়িয়ে তোমার দৃষ্টিতে পড়ার চেষ্টা

করেছিলাম কিন্তু তুমি লক্ষ্য করলে না। ফোন করলে ঐ আবতুল এসে ধরে। কলিংবেল টিপলেও সেই আবতুল।

স্থমন থামলে চকিতা আরও ঘন হয়ে বলল, আমি একটা সামান্য মেয়ে, আমার জন্যে তুমি এত করলে কেন স্থমন ?

স্থমন হাসিমাখা চোখে তাকিয়ে বলল, জানিনা কেন করলাম। হয়ত অজান্তে ভালবেসে ফেলেছি। এই সময়ে হঠাৎ স্থমন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, ঈস রাত তো কম হল না! সে গাড়ী চালিয়ে দিল।

কোথায় যাচ্ছি আমরা স্থমন।

জীবনলাল চ্যাটার্জির বাড়ী। ফোন করে তোমায় উদ্ধারে এসেছি তিনি হয়ত এখনও প্রচণ্ড তুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

কিন্তু সেখানে কেন স্থমন ?

সেখানেই তো আমাদের মিলন হবে। তোমার বাবা তোমাকে কত ভালবাসেন জানো না। আমার হাতে তোমাকে সঁপে দেবার জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছেন।

চকিতা আর কোন কথা বললোনা। চুপ করে স্থমনের পাশে বসে রইল। ও যেন পরম নির্ভরতায় নিজের ভার একজনকে দিয়ে মুক্তি লাভ করতে চাইল। ও আজ এই ভেবে নিল, মেয়েরা কোন অবস্থায়ই স্বাধীন ও একক জীবন যাপন করতে পারে না। ঈশ্বরই তাদের শত্রু।

★